নন্দিত নরকে

হুমায়ূন আহমেদ

সূচিপত্র

১. রাবেয়া 2
২. মাস্টার কাকা 25
৩. মা 38
৪. আমাদের সংসার 50
৫. চাকরি 63
৬. মন্টু 97

১. রাবেয়া

রাবেয়া ঘুরে ঘুরে সেই কথা কটিই বার বার বলছিল।

রুনুর মাথা নিচু হতে হতে থুতনি বুকের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। আমি দেখলাম তার ফর্সা কান লাল হয়ে উঠেছে। সে তার জ্যামিতি-খাতায় আঁকিবুকি কাটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দাদা একটু পানি খেয়ে আসি বলে ছুটতে ছুটিতে বেরিয়ে গেল। রুনু বারো পেরিয়ে তেরোতে পড়েছে। রাবেয়ার অশ্লীল কদর্য কথা তার না বোঝার কিছু নেই। লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠেছিল। হয়তো সে কেঁদেই ফেলত। রুনু অল্পতেই কাঁদে। আমি রাবেয়াকে বললাম, ছিঃ রাবেয়া, এসব বলতে আছে? ছিঃ! এগুলি বড় বাজে কথা। তুই কর্তা বড় হয়েছিস।

রাবেয়া আমার এক বৎসরের বড়ো। আমি তাকে তুই বলি। পিঠা পিঠি ভাইবোনেরা এক জন আরেক জনকে তুই বলেই ডাকে। রাবেয়া আমাকে তুই বলে। আমার প্রতি তার ব্যবহার ছোটবোনসুলভ। সে আমার কথা মন দিয়ে শুনল। কিছুক্ষণ ধরেই বালিশের গায়ে চাদর জড়িয়ে সে একটা পুতুল তৈরি করছিল। আমার কথায় তার ভাবান্তর হল না। পুতুল তৈরি বন্ধ রেখে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। পা নাচাতে নাচাতে সে নোংরা কথাগুলি আগের চেয়েও উঁচু গলায় বলল। আমি চুপ করে রইলাম। বাধা পেলেই রাবেয়ার রাগ বাড়বে; গলার স্বর উঁচু পর্দায় উঠতে থাকবে। পাশের বাসার জানালা দিয়ে দু-একটি কৌতূহলী চোখ কী হচ্ছে দেখতে চেষ্টা করবে।

রাবেয়া বলল, আমি আবার বলব।

বেশ।

কী হয় বললে?

আমি কাতর গলায় বললাম, সে ভারি লজ্জা রাবেয়া। এটা খুব একটা লজ্জার কথা।

তবে যে ও আমাকে বলল।

কে?

আমি বুঝতে পারছি, রাবেয়া নিশ্চয়ই কথাগুলি বাইরে কোথাও শুনে এসেছে। কিন্তু রাবেয়াকে, যার বয়স গত আগষ্ট মাসে বাইশ হয়েছে, তাকে সরাসরি এমন একটি কদর্য্য কথা কেউ বলতে পারে ভাবি নি।

আমি বললাম, কে বলেছে?

আজ সকালে বলেছে।

কে সে?

ঐ যে লম্বা ফর্সা।

রাবেয়া সেই ছেলেটির আর কোনো পরিচয়ই দিতে পারবে না। আবারও রাবেয়াবেড়াতে বেরুবে, আবার হয়তো কেউ এমনি একটি ইতর অশ্লীল কথা বলে বসবে তাকে।

খোকা তোর দুধ।

মা দুধের বাটি টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। কাল রাতে তাঁর জ্বর এসেছিল। বেশ বাড়াবাড়ি রকমের জ্বর। বাবা মাঝরাত্তিরে আমার দরজায় ঘা দিয়েছিলেন। আমার ঘুমের ঘোর না কাটতেই শুনলাম, তোর কাছে এ্যাসপিরিন আছে খোকা?

স্বপ্ন দেখছি এই ভেবে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই মায়ের কান্না শুনলাম। মা অসুখ-বিসুখ একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। অল্প জ্বর, মাথা ব্যাথা–এতেই কাহিল।

বাবা আবার ডাকলেন, খোকা, তোর কাছে এ্যাসপিরিন আছে?

তোষকের নিচে আমার ডাক্তারখানা। এ্যাসপিরিন, ডেসপ্রোটেব এই জাতীয় ট্যাবলেট জমান আছে। অন্ধকারেই আমি মাঝারি সাইজের ট্যাবলেট খুঁজতে লাগলাম। এ ঘরে আলো নেই। কোথায় যেন তার জ্বলে গেছে। রাতে হ্যাঁরিকেন জ্বালান হয়। ঘুমুবার সময় রুনু হারিকেন নিবিয়ে দেয় আলোতে রুনুর ঘুম হয় না। বাবা বললেন, খোকা, পেয়েছিস?

হুঁ। কী হয়েছে?

তোর মার জ্বর।

জ্বরে এ্যাসপিরিন কী হবে?

খুব মাথাব্যথাও আছে।

অ।

তিনটি ট্যাবলেট হাতে নিয়ে দরজা খুলতেই বারান্দায় লাগান পঁচিশ পাওয়ারের বাল্বের আলো এসে পড়ল। কী বাজে ব্যাপার! একটিও এ্যাসপিরিন নয়। বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, ঘরে দেশলাই রাখতে পারিস না?

মনে পড়ল ড্রয়ারে একটি নতুন দেশলাই আর তিনটি বৃস্টল সিগারেট রয়েছে। সারা দিনে পাঁচটার বেশি খাব না ভেবেও সাতটা হয়ে গেছে। আর এখন এই মধ্যরাতে একটা তো জ্বালাতেই হবে। কিছুক্ষণের ভেতরই একটু সিগারেট ধরাব, এতেই মনটা ভরে উঠল। বাবা এ্যাসপিরিন নিয়ে চলে গেলেন। দেশলাই জ্বালাতেই চোখে পড়ল, রাবেয়া বিশ্রীভাবে শুয়ে রয়েছে। প্রায় সমস্তটা শাড়ি পাকিয়ে পুটলি বানিয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে রেখেছে। শীতের সময় মশা থাকে না, মশারির আবুও সেই কারণেই অনুপস্থিত। বাবোব গলা শোনা গেল, নাও শানু, খেয়ে ফেল ট্যাবলেটটা।

আশ্চর্য! বাবা এমন আদুরে গলায় ডাকতে পারেন! আমার লজ্জা করতে লাগল। বাবা আবার ডাকলেন, শানু শানু।

শাহানা নামটাকে কী সুন্দর করে ভেঙে শানু ডাকছেন বাবা। আমার আর বাবার ঘরের ব্যবধানটা বাঁশের বেড়ার ব্যবধান। উপরের দিকে প্রায় দু হাত খানিক ফাঁকা। সামান্যতম শব্দের কথাও আমার ঘকে ভেসে আসে। আমি একটা চুমুর শব্দও শুনলাম।

আমার মাঝে মাঝে ইনসমনিয়া হয়। আমার তোষকের নিচে চারটে ভেলিয়াম-টু ট্যাবলেট আছে। কিন্তু আমি কখনো ভেলিয়াম খাই না। ঘুমের ওষুধ হার্ট দুর্বল করে। আমার বন্ধু সলিল ঘুমোনর জন্য দুটি মাত্র বড়ি খেয়ে মারা গিয়েছিল। তার হার্টের অসুখ ছিল। আমারও হয়তো আছে। আমার মাঝে মাঝে বুকের বাম পাশে চিনচিনে ব্যথা হয়।

আমি হাজার ইনসমনিয়াতেও ঘুমের ওষুধ খাই না। মাঝে মাঝে এ জন্যে আমার বেশ অসুবিধা হয়। মাঝরাতে বাবা যখন শানু শানু, এই শাহানা বলে ডাকতে থাকেন, তখন আমার কান গরম হয়ে ওঠে। নাক ঘামতে থাকে। হার্টের স্পন্দন দ্রুত ও স্পষ্ট হয়। রাতের নাটকের সব কটি কথা আমার জানা। মা বলেন, আহা করি কি? ছি! বাবা ফিসফিস করে কী বলেন। তাঁর গলা খাদে নেমে আসে। মা জড়িত কণ্ঠে হাসেন। আমি দু হাতে আমার কান বন্ধ করে ফেলি। নিজের বুকের শব্দটা সে সময় বড়ো বেশি স্পষ্ট মনে হয়। কিছুক্ষণের ভিতরই আবার সব নীরব হয়।

রুনু আর রাবেয়া ঘুমের ঘোরে বিজবিজ করে। টেবিল ঘড়ির টক টিক টক টক শব্দ আবার ফিরে আসে। আমি টেবিলে রাখা জগে মুখ লাগিয়ে ঢকঢ়ক করে পানি খেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াই।

বারান্দার এক পাশে দুটি হাস্নুহেনা গাছ আছে। মা বলেন হাছনাহেনা। দুটোই প্রকাণ্ড। রাতের বেলায় তার পাশে এসে দাঁড়ালে ফুলের গন্ধে নেশার মতো হয়। হামুহেনার গন্ধে

নাকি সাপ আসে। মন্টু এই গাছের নিচেই এক বার একটা মস্ত সাপ মেরেছিল। চন্দ্রবোড়া সাপ। মা দেখে আঁতকে উঠে বলেছিলেন, কি করলি রে মন্টু, এর জোড়াটা যে এবার তোকে খুঁজে বেড়াবে।

আমি যদিও এ-সব বিশ্বাস করতাম না, তবু আমার ভয় লাগছিল। আমি তন্ন তন্ন করে অন্য সাপটাকে খুঁজলাম। বাড়ির চারপাশে কার্বলিক এসিড দেওয়া হল। মাস্টার চাচা বললেন, যে সাপটা রয়ে গেছে সেটা পুরুষ সাপ। সাপ দেখে তিনি স্ত্রী-পুরুষ বলতে পারতেন। কদিন সবাই খুব ভয়ে ভয়ে কাটালাম, যদিও সেই পুরুষ সাপটিকে কখনো দেখা যায় নি।

রাবেয়া বলল, মা আমি দুধ খাব।

মার কাল রাতে জ্বর এসেছিল। তাঁর মুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। রাবেয়ার কথা শুনে মারি মুখ আরো শুকিয়ে গেল। তাঁকে বাচ্চা খুকির মতো দেখাতে লাগল। আমি জানি আমরা কেউ যখন কোনো একটা জিনিসের জন্যে আব্দার করি এবং মা যখন সেটি দিতে পারেন না। তখন তাঁর মুখ এমনি লম্বাটে হয়ে বাচ্চা খুকিদের মতো দেখাতে থাকে। তাঁর নাকের পাতলা চামড়া তিরতির করে কাঁপতে থাকে। ছোট বয়সে মার এই ভঙ্গিটাকে আঁমার খুব খারাপ লাগত। আমি একটি জিনিস চেয়েছি, মা সেটি দিতে পারছেন না। তাঁর মুখ বাচ্চা খুকিদের মতো হয়ে গিয়েছে। নাকের ফর্সা পাতলা পাতা তিরতির করে কীপছে। মায়ের এই ভঙ্গিটাকে আমার অপরাধীর ভঙ্গি বলে মনে হত। আমি মাকে কী করে কষ্ট দেওয়া যায় তা ভাবতে থাকতাম। মোর গায়ে একটি টিকটিকি ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে হত। মা

টিকটিকিকে বড়ো ভয় পান। মুখে বলেন। ঘৃণা, কিন্তু আমি জানি এ তাঁর ভয়। এক বার মা ভাত খেতে বসেছেন, হঠাৎ ছাদ থেকে একটা টিকটিকির বাচ্চা এসে পড়ল তাঁর মাথায়। তিনি হড়হড় করে বমি করে ফেললেন। মার উপর রাগ হলেই আমি টিকটিকি খুঁজতাম। কিন্তু টিকটিকি খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। পেলেও ধরা যেত না। কাপড়ের বল বানিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতাম দেয়ালে টিকটিকির গায়। টুপ করে তার ল্যাজ খসে পড়ত। সেই ল্যাজও মা ঘেন্না করতেন। মা কখনো আমাদের কিছু বলতেন না। মা বড়ো বেশি ভালোমানুষ। বাবা মারতেন প্রায়ই ভীষণ মার। মা বুলতেন, আহা কী করা! আহা ব্যথা পায় না? বাবা বলতেন, যাও, সরে যাও সামনে থেকে। আদর দিয়ে মাথায় তুলেছ তুমি। মাকে তখন বড়ো বেশি অসহায় মনে হত। আর আমার ইচ্ছে হত কাল ভোরেই বাড়ি থেকে পালাব। আর কখনো আসব না।

মা আমাকে দুধ দাও। রাবেয়া জোন করতে লাগল। আমি বাটিটি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। মা মৃদু। কণ্ঠে বললেন, আহা, খা না তুই, তোর পরীক্ষা।

দুধের বিলাসিতাটুকু আমার জন্যেই। সামনেই এম.এস.সি ফাইনাল, রাত জেগে পড়ি। নটার দিকে মা দুধ নিয়ে আসেন। আমি দুধে চুমুক দিতেই মা নীরবে রাবেয়ার শাড়ি থেকে একটি একটি করে সেফটিপিন খুলতে থাকেন। রাবেয়ার শাড়িতে গোটা দশেক সেফটিপিন সারা দিন লাগান থাকে। সমস্ত দিন সে ঘুরে বেড়ায়। তার অনাবৃত শরীর ভুলেও যেন কারুর চোখে না পড়ে, এই ভয়েই মা এ করেন। রাবেয়াকে ঘরে আটকে রাখা যাবে না।–তাকে সালোয়ার কামিজও পরান যাবে না। তার সে-বয়স নেই। অথচ সবাই রাবেয়ার দিকে অসংকোচে তাকাবে। বয়স হলেই ছেলেরা মেয়েদের দিকে তাকায়। সেই তাকানীয় লজ্জা থাকে, দৃষ্টিতে সংকোচ থাকে। কিন্তু রাবেয়ার ব্যাপারে সংকোচ বা

লজ্জার কোনো কারণ নেই। রাবেয়াকে যে-কেউ অতি কুৎসিত কথা বললেও সে হাসিমুখে সে-কথা শুনবে। বাড়ি এসে অনায়াসে সবাইকে বলে বেড়াবে।

মা রাবেয়ার পাশে বসে রাবেয়ার মাথায় হাত রাখলেন। আমি একটি ছোট কিন্তু স্পষ্ট দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। রাবেয়া ঢকচক করে দুধ খাচ্ছে। রাবেয়া হয়তো ঠিক রূপসী নয়। কিংবা কে জানে হয়তো রূপসী। রং হালকা কালো। বড়ো বড়ো চোখ, স্বচ্ছ দৃষ্টি, সুন্দর ঠোঁট। হাসলেই চিবুক আর গালে টোল পড়ে। যেসমস্ত মেয়ে হাসলে টোল পড়ে, তারা কারণ্যে-অকারণে হাসে। তারা জানে হাসলে তাদের ভালো দেখায়। রাবেয়া তা জানে না, তবু সে হাসে। কারণে-অকারণে হাসে। রাবেয়ার কপালে, ঠিক মাঝখানে একটা কাটা দাগ আছে। ছোটবেলায় চৌকাঠে পড়ে গিয়েছিল। দুধ শেষ করে রাবেয়া বলল, বাজে দুধ। ছিঃ!

মা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, শুভাপুরের পীর সাহেবের কাছে যাবি এক বার? শুভাপুরে এক পীর সাহেব থাকেন। পাগল ভালো করতে পারেন বলে খ্যাতি। শুভাপুর এখান থেকে আট মাইল। সাইকেলে ঘণ্টাখানেক লাগে, কিন্তু আমি জানি পীর-ফকিরে কিছু হবে না। বড়ো ডাক্তার যদি কিছু করতে পারে। কিন্তু আমাদের পয়সা নেই। আমার ছোট হয়ে যাওয়া শার্ট মন্টু পরে। আমরা কাপড় কিনি বৎসরে এক বার, রোজার ঈদে।

রুনু এল একটু পরেই। আড়চোখে দু-তিন বার তাকাল রাবেয়ার দিকে। না, রাবেয়া সেই কুৎসিত কথাগুলি আর বলছে না। রুনু হাই তুলল। তার ঘুম পাচ্ছে। চোখ ফুলে উঠেছে। রাবেয়ার নোংরা কথা শুনে রুনুর কেমন লেগেছিল কে জানে। রুনুর বয়স এখন তেরো। আগামী নভেম্বরে চৌদ্দতে পড়বে। রুনুর বৃশ্চিক রাশি। আমার যখন এমন বয়স ছিল,

তখন এ ধরনের কথা শুনে বেশ লাগত। সেই বয়সে মেয়েদের কথা ভাবতে আমার ভালো লাগত। টগর ভাইয়ের বাসায় সন্ধ্যাবেলা অঙ্ক বুঝতে যেতাম। নীলু বলে তার একটা ছোট বোন ছিল। বড়ো হয়ে এই মেয়েটিকে বিয়ে করব ভেবে বেশ আনন্দ হত আমার। নীলুর সঙ্গে কথা বলতেও লজ্জা লাগত, কথা বেধে যেত মুখে। নীলু। যখন আমার হাত ধরে টেনে বলত, আসুন না। দাদু ভাই, লুডু খেলি। তখন অকারণেই আমার কান লাল হয়ে উঠত। গলার কাছটায় ভার-তার লাগাত।

রুনুরও কি কোনো ছেলেকে ভালো লাগে? রুনুও কি কখনো ভাবে, বড়ো হয়ে আমি এই ছেলেটিকে বিয়ে করব? কে জানে। হয়তো ভাবে, হয়তো ভাবে না। রুনু বড় লক্ষ্মী মেয়ে। এত লক্ষ্মী আর এত কোমল যে আমার মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। কেন জানি না। আমার মনে হয়, এ ধরনের মেয়েরা সুখ পায় না জীবনে। আমি রুনুকে অনেক বড়ো করব। রুনু ডাক্তার হবে বড়ো হলে। ষ্টেথোসকোপ গলায়, কালো ব্যাগ হাতে মেয়ে ডাক্তারদের বড়ো সুন্দর দেখায়। রুনু অঙ্ক ভালো পারে না। আমি তাকে নিজের পড়া বন্ধ রেখে এ্যালজেবরা বোঝাই। ডাক্তারী পড়তে অবশ্যি অঙ্ক লাগে না।

সেদিন রুনুর অঙ্কখাতা উল্টে চমকে গিয়েছিলাম। বেশ গোটা গোটা করে লেখা আমি ভালোবাসি। পরের কথাগুলি পড়ে অবশ্যি আমি লজ্জাই পেলাম। সেটি একটি ছেলেমানুষী কবিতা। আমি পৃথিবীর এই সৌন্দর্য ভালোবাসি, গাছপালা-গান ভালোবাসি–এই জাতীয়। আমি বললাম, সুন্দর কবিতা হয়েছে রুনু।

রুনু লজ্জায় গলদা চিংড়ির মতো লাল হয়ে বলল, যাও, ভারি তো। এটা মোটেই ভালো হয় নি।

আমি বললাম, তাহলে তো মনে হয়। অনেক কবিতা লিখেছিস।

উঁহু। রুনু মাথা নিচু করে হাসতে লাগল।

আমি বললাম, দেখা রুনু, লক্ষ্মী মেয়ে তুই।

রুনু আরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে আমার ট্রাঙ্ক খুলল। তার যাবতীয় গোপন সম্পত্তি আমার টাঙ্কে থাকে। এই বয়সে কত তুচ্ছ জিনিস অন্যের চোখের আড়াল করে রাখতে হয়। কিন্তু রুনুর নিজস্ব কোনো বাক্স নেই। আমার ট্রাঙ্কের এক পাশে তার দুটি বড়ো বড়ো চারকোণা বিস্কুটের বাক্স থাকে। আর কিছু খাতাপত্রও থাকে দেখছি। বুনু হাতির ছবি আকা একটা দুনাম্বরী খাতা নিয়ে এসে লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল।

আমি বললাম, তুই পড়ে শোনা আমাকে।

না, তুমি পড়।

দে তাহলে আমার হাতে।

রুনু খাতাটা গুঁজে দিয়ে দৌড়ে পালাল। দেখলাম সব মিলিয়ে বারোখানা কবিতা। দুটি মায়ের ওপর, একটি পালার ওপর। (পলা আমাদের পোষা কুকুর। এক দুপুরে কোথায় যে চলে গেল!) একটি মন্টুর সাপ মারা উপলক্ষে–

মন্টু ভাই তো মারলেন মস্ত বড়ো সাপ
চার হাত লম্বা সেটি–কী তার প্রতাপ!

মনে মনে ভাবলাম, রুনুকে একটি ভালো খাতা কিনে দেব। রুনু খাতা ভর্তি করে ফেলবে কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পে বাচ্চা মেয়ের একটি চরিত্র আছে। মেয়েটি লিখতে শিখে আদি ঘরের দেয়াল, বইয়ের পাতা, মার হিসেবের খাতায় যা মনে আসত তাই লিখে বেড়াত। মেয়েটির দাদা তাকে একটি চমৎকার খাতা দিয়েছিল, যা তার জীবনে পরম সখের সামগ্রী হয়েছিল। কিন্তু আমার হাতে টাকা ছিল না। তবু আমি মনস্থির করে ফেললাম, রুনুকে একটা খুব ভালো খাতা কিনে দেব। আমার মনে পড়ল হাতি মার্ক যে-খাতাটায় রুনু কবিতা লিখেছে, রুলু সেটি আমার কাছ থেকেই চেয়ে নিয়েছিল। যেখানে আমার নাম ছিল, সেটি কেটে রুলু বড়ো বড়ো করে নিজের নাম লিখেছে। দিনে কঘণ্টা পড়ছি তার হিসেব রাখার জন্যে খাতাটি কিনেছিলাম। সপ্তাহ দুয়েক যাবার পরও যখন কিছু লেখা হয় নি, তখন এক দিন রুনু সংকুচিতভাবে আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। সাপের মতো একেবেঁকে বলল, দাদা খাতাটা আমাকে দাও না।

কোন খাতা?

এইটে।

যা, নিয়ে যা।

রুলু খাতা হাতে চলে গেল। তার মুখে সেদিন যে—খুশির আভা দেখেছি, আমি আবার তা দেখব। সাড়ে তিন টাকা দিয়ে প্লাষ্টিকের সুদৃশ্য কাভারের চমৎকার একটি খাতা কিনে দেব তাকে।

আমার হাতে যদিও টাকা ছিল না, তবু আমি রুনুকে খাতা কিনে দিয়েছিলাম। রুণুকে বড়ো ভালোবাসি। আমি। বড়ো ভালোবাসি। রুনুকে দেখলেই আমার আদর করতে ইচ্ছে হয়। রুলু বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে। রুনুর ভালো নাম সালেহা। রুনু নামটা আমারই দেওয়া। রুনুর জন্যে রুনু নামটাই মানানসই। রুনু নামে কেমন একটা বাজনার আমেজ আসে। আবার যখন দীর্ঘ স্বরে ডাকা হয় রুউউউউ নুউউউউ তখন কেমন একটা আমেজ আসে। রুনু বলল, দাদা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

মা মশারি খাটিয়ে দিয়ে গেছেন। বেশ মশা এখন। রাতের সঙ্গে সঙ্গে মশাও বাড়তে থাকবে। আমার কানের কাছে গুনগুন করবে তারা। পড়ায় মন দিতে পারছি না, এম. এস. সি-তে খুব ভালো রেজাল্ট করতে হবে আমার। একটা ভদ্র ভালো বেতনের চাকরির আমার বড়ো প্রয়োজন। রুনু গুটিসুটি মেরে রাবেয়ার পাশে শুয়ে পড়েছে। অবশ্যি সে এখন ঘুমুবে না। যতক্ষণ ঘরে আলো জ্বলে ততক্ষণ রুনু ঘুমুতে পারে না।

আমার পাশেই রাবেয়া আর রুনু শুয়ে আছে! এত পাশে যে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। রাবেয়াটা শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে। এক-এক বার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদে। সে কানা বিলম্বিত দীর্ঘ সুরের কানা। পলাও মাঝে মাঝে এমন কাঁদত। মা বলতেন, দূর দূর। কুকুরের কান্না নাকি অমঙ্গলের চিহ্ন। গৃহস্থদের বিপদ দেখলেই কুকুর বেড়াল জাতীয় পোষা জীবগুলি কান্দে। রাবেয়ার কান্নার উৎস আমরা জানি না। হয়তো সারা দিনের অবরুদ্ধ কানা রাতে অঝোর ধারার মতোই নেমে আসে। রাবেয়ার কান্নায় রুনু ভয় পায়। বলে, দাদা, আপা কাঁদছে কেমন দেখ। আমি বলি, ভয় কি রুনু? উঁচু গলায় ডাকি, এই, এই রাবেয়া কাঁদা কেন? কী হয়েছে?

কোনো কোনো রাতে অপূর্ব জোছনা হয়। জানালা গলে নরম আলো এসে পড়ে আমাদের গায়। জোছনায় নাকি হানুহেনা খুব ভালো ফোটে। নেশা-ধরান ফুলের গন্ধে ঘর ভরে যায়। আমি ডাকি, রুনু ঘুমিয়েছিস?

উঁহু।

গল্প শুনবি?

বল।

কী গল্প বলব ভেবে পাই না। গল্পের মাঝখানে থেমে গিয়ে বলি, এটা নয়, আরেকটা বলি। রুনু বলে, বল। সে গল্পও শেষ হয় না। আচমকা মাঝপথে থেমে গিয়ে বলি, তুই একটা গল্প বল, রুনু।

আমি বুঝি জানি?

যা জিনিস তা-ই বল। বল না।

উঁহু, তুমি বল দাদা।

রুনুকে আমার টমাস হার্ডির এ পেয়ার অব র আইজ-এর গল্প বলতে ইচ্ছে হয়। আমার মনে হয়। রুনুই যেন এ পেয়ার অব র আইজের নায়িকা। কিন্তু রুনু আমার ছোট বোন। সামনের নভেম্বরে সে চৌদ্দ বৎসরে পড়বে। এমন প্রেমের গল্প তাকে কি করে বলি। রুনু বলে, থেমে গেলে কেন দাদা? শেষ কর না।

আমি গল্প বন্ধ করে জিজ্ঞেস করি, রুনু, তোর কাকে সবচে ভাল লাগে?

তোমাকে।

হয়তো আমাকে তার সত্যি ভালো লাগে। বাইরে তীব্র জোছনা, ফুলের অপরূপ সৌরভ, মশারি উড়িয়ে নেবার মতো বাতাস। বুকের কাছটায় গভীর বেদনা অনুভব করি।

এই আপা, এই!

কী হয়েছে রুনু?

দাদা, আপা আমার গায়ে ঠ্যাং তুলে দিয়েছে।

রাবেয়া ঘুমের ঘোরে পা তুলে দিয়েছে রুনুর গায়ে। বেশ স্বাস্থ্য রাবেয়ার। স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের হয়তো ভরা যৌবনের মেয়ে বলে। ভরা যৌবনকথাটায় কেমন একটা অশ্লীলতার ছোঁয়া আছে। আমার কাছে যুবতী কথাটা তরুণীর চেয়ে অনেক অশ্লীল মনে হয়। কে জানে কেন!

পাশের বাসার লোকজনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত যত বাড়ে আশেপাশের শব্দ। ততই স্পষ্ট হয়। দিনে কখনো থানার ঘড়ির ঘণ্টা শুনি না। রাত নটার পর থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশের বাসায় কে যেন কাশল। কিছুক্ষণ পর খিলখিল করে হাসির শব্দ শুনলাম। হাসির স্বরগ্রাম বেশ উঁচু। নিশ্চয়ই নাহার ভাবী। নাহার ভাবী উঁচু গলায় কথা বলেন। বিধি ডাগর আখি যদি দিয়েছিলো?–নাহার ভাবী রেকর্ড চড়িয়েছেন। প্রায় রা েতই

তিনি গান শোনেন। এই গানটি তাঁর ফেবারিটি। আমার রবীন্দ্রসংগীতের প্রাঙ্গণে মোর শিরিষশাখায় সব চেয়ে ভালো লাগে। এই রেকর্ডটি তাঁরা খুব কম বাজান। বিধি। ডঃ গর আখি বড়ো করুণ। নাহার ভাবী তো খুব হাসিখুশি। অথচ এমন একটি করুণ গান তাঁর পছন্দ কেন কে জানে। যারা খুব হাসি— খুশি, করুণ সুর তাদের খুব মুগ্ধ করে–কোথায় যেন পড়েছি।

রুনু হঠাৎ ডাকাল, দাঙ্গা ঘুমিয়েছ?

না।

নাহারা ভাবী গান বাজাচ্ছে।

হুঁ।

এর পর কোন গানটা বাজবে জান?

না, কোনটা?

আধুনিক। জোনাকি ঝিকিমিকি জ্বলো আলো।

সত্যি সত্যিই তাই বাজল। রুনু শব্দ করে হাসল।

আমি বললাম, তুই জানালি কী করে?

আমিই তো আজ দুপুরে সাজিয়ে রেখেছি। তোমার গান সবার শেষে।

রাবেয়া ঘুমের ঘোরে বলল, না না, বললাম তো যাব না। হারুন ভাই যদি সত্যি সত্যি রাবেয়াকে বিয়ে করে ফেলত, তবে আর মাঝরাতে গান শোনা হত না। রাবেয়ার গান ভালো লাগে না। কে জানে, কী তার ভালো লাগে। হারুন ভাইদের বাসার সবাই রাজি হলেও এ বিয়ে হত না।

রাবেয়া যদি কোনো দিন ভালো হয়ে ওঠে, তবে তাকে খুব এক জন হৃদয়বান ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব। হারুন ভাইয়ের মতো একটি নিখুঁত ভালো ছেলে। সেও গভীর রাতে রেকর্ড বাজাবে। চাঁদের আলো এসে পড়বে তাদের দুজনার গায়। ভদ্রলোক রাবেয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলবেন, তোমার কপালে কিসের দাগ রাবেয়া?

পড়ে গিয়েছিলাম চৌকাঠে।

তিনি সেই কাটা দাগের উপর অনেকক্ষণ হাত রাখবেন। তারপর চুমু খাবেন সেখানটায়।

রুনু আমায় ডাকল, দাদা, তোমার গান হচ্ছে।

আমি শুনলাম প্রাঙ্গণে মোর শিরিষশাখায় ফাগুন মাসে কী উচ্ছ্বাসে। আবেগে আমার চোখ ভিজে উঠল। গানটি আমার বড়ো ভালো লাগে।

গ্রান শুনতে শুনতে আমি নাহার ভাবীর মুখ মনে আনতে চেষ্টা করলাম। মাঝে মাঝে খুব পরিচিত লোকদের মুখও আমি কিছুতেই মনে আনতে পারি না। নাহার ভাবীর মুখটা

ত্রিভূজ আকৃতির। হারুন ভাইদের বাসার সবার মুখ আবার লম্বাটে, ডিমের মতো। তারা সবাই ভারি সুন্দর। কয় পুরুষ ধনী থাকলে চেহারায় একটা আলগা লালিত্য আসে কে জানে। ভাবতে ভালো লাগে, এই পরিবারটিতে কোনো দুঃখ নেই। মাসের পনের তারিখের পর থেকে খরচ বাঁচোনর আপ্রাণ চেষ্টা এ পরিবারের মায়ের করতে হয় না। ইচ্ছে হলেই ইংরেজি ছবির মতো মোটরে করে। এরা আউটিং-এ চলে যায়। স্বাধীনতা-দিবসে এ পরিবারের মেয়েরারাইফেল শুটিংএ ফ্যাক্ট সেকেণ্ড হয়।

তারা কবে এসেছিল শান্তি কটেজে আমার মনে নেই, তবে খুব বৃষ্টি সেদিন। আমি, রাবেয়া আর বুনু বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। জীপ থেকে ভিজতে ভিজতে নামল সবাই। প্রথমে রুনুর বয়সী একটি মেয়ে। নাম শীলা। বাবা আদর করে ডাকেন শীলু মা, মা শুধু বলেন শীলু। তারপর বড় ভাই, চোখে বুড়ো মানুষের চশমা হলেও একেবারে ছেলেমানুষী চেহারা। গাড়ি থেকে নেমেই চেঁচিয়ে উঠল, কী চমৎকার বাড়ি শীলু। বাবা নামলেন, মা নামলেন, চাকর-বাকর নামল। আজিজ সাহেবদের চলে যাওয়ার অনেক দিন পর বাড়িটা তরল। বর্ষা গিয়ে শীত এল। ব্যাডমিন্টন কোর্ট কেটে হৈ হৈ করে দুই ভাইবোন লাভ ইলেভেন, লাভ টুয়েলাভ করে খেলতে লাগল।

রুণু বড়ো লাজুক, নয়তো সে গিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করতে পারত। আমার খুব ইচ্ছে হত শীলু। মেয়েটির সঙ্গে রুনুর ভাব হোক। আমি দেখতাম, সন্ধ্যা হলেই শীলু। তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কবুতর ওড়াত। তাদের দটি লোটন পায়রা ছিল। কারণ্যে-অকারণে যেত। রাবেয়া। তাকে আমরা বাধা দিতাম না। বাধা পেলেই রাবেয়ার মেজাজ বিগড়ে যেত। চিটাগাং-এ বড়ো খালার ভাসুর মস্ত ডাক্তার। তিনি বলেছিলেন, যা ইচ্ছে হয় তা-ই করতে দেবেন। একে। দেখবেন, যা এবনর্মালিটি আছে, তা আপনি সেরে

যাবে। আমাদের চিকিৎসার টাকা ছিল না। নিখরচার চিকিৎসা তাই আমরা প্রাণপণে করতাম। এক দিন মা কাঁদো কাঁদো হয়ে আমার টেবিলে একটি কী যেন নামিয়ে রাখলেন। দেখি চমৎকার একটি কলমদানি। ধবধবে সাদা দুটি পেঙ্গুইন পাখি কলমদানের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। পেঙ্গুইন দুটোর মাঝামাঝি একটি বাচ্চা পেঙ্গুইন হাঁ করে শূন্যে তাকিয়ে। সেই হাঁ-করা মুখেই কলম রাখার জায়গা। আমার এ-জাতীয় জিনিসের দাম সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবু মনে হল এ অনেক দামী। মা কাঁপা গলায় বললেন, রাবেয়া এনেছে। ওবাড়ি থেকে।

আমার প্রথমেই যা মনে হল, তা হল রাবেয়া না-বলেই এনেছে। কিন্তু রাবেয়া পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বলতে লাগল, আমি আনি নি, ওরা আপনি দিয়েছে।

মিথ্যা রাবেয়া বলে না। কিন্তু ওরাই—বা কেন দেবে? এমন একটা সৌখিন জিনিস হঠাৎ করে দিতে হলে যে দীর্ঘ পরিচয় প্রয়োজন, তা কি আমাদের আছে? খবরের কাগজে কলমদানটি মুড়ে রুনু প্রথম বারের মতো ও-বাড়ি গেল। রাবেয়া নাকী সুরে বলতে লাগল, আমার জিনিস রুনু যে বড়ো নিয়ে চলল, ভেঙে ফেললে আমি মজা না–দেখিয়ে ছাড়ব?

জল্পনা গেল রাবেয়া আনে নি, ওরাই দিয়েছে। না, ঠিক ওরা নয়, হারুন বলে যে-ছেলেছি। শিগগিরই বিদেশে যাবে, শুধু একটি পাসপোর্টের অপেক্ষা-সে দিয়েছে। শীলু আর তার মাও ঠিক জানতেন না ব্যাপারটা। তাঁরাও একটু অবাক হয়েছেন। শীলুর সঙ্গে এই অল্প সময়েই খুব ভাব হয়ে গেল। রুনুর। একটি লম্বাটে মিমি চকলেট আর বিভূতিভূষণেব দৃষ্টিপ্রদীপ সে নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, ওরা কেমন লোক রুনু?

খুব ভালো।

চকলেট পেয়ে গলে গেছিস, না?

যাও। শীলু। কিন্তু সত্যি ভালো। জান, শীলু মোটর চালাতে পারে।

যাহা এতটুকু বাচ্চা মেয়ে!

সত্যি। ওদের মোটর সারাতে দিয়েছে। যখন আসবে, তখন সে দেখাবে চালিয়ে।

আর কি গল্প হল?

কত গল্প, ওদের অনেক রেকর্ড আছে।

অনেক?

হুঁ, হিসেব নেই। এত। আমাকে রোজ যেতে বলেছে।

শুধু তুই যাবি, ও আসবে না?

আসবে না কেন? নিশ্চয়ই আসবে।

শীলু অবশ্যি এসেছে কালে-ভদ্রে। যখন তার রুনুর সঙ্গে দরকার পড়ত তখনি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকত, রুনুরুনু। রুনু সব কাজ ফেলে ছুটে যেত। আমি মনে মনে চাইতাম, মেয়েটা ঘন ঘন আসুক আমাদের কাছে। তার সাথে গল্প করার ইচ্ছে হত আমার। আমি

মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, তার সঙ্গে যদি আলাপ হয় তবে কী বলব। দু রাতে তাকে স্বপ্নেও দেখেছি।

একটি স্বপ্নে সে শাড়ি পরে এসে খুব পরিচিত ভঙ্গিতে বসেছে আমার টেবিলে। আমি বললাম, টেবিলে কেন শীলু, চেয়ারে বস।

শীলু হাসতে হাসতে বলল, টেবিলে বসতেই যে আমার ভালো লাগে। হাতে একটা চামচ নিয়ে টুং টাং করে চায়ের কাঁপে জলতরঙ্গের মতো একটা বাজনা বাজাতে লাগল সে।

দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখেছি দিনে-দুপুরে। অনুরোধের আসর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ দেখলাম শীলু এল। আগের মতোই শাড়ি-পরা। আমি বলছি, শীলু, এত দেরি কেন, কী চমৎকার গান হচ্ছিল।

আমার নাম তো শীলা, আপনি শীলু ডাকেন কেন?

শীলুর সঙ্গে আমার কথা হত এই ধরনের। হয়তো বিকেলে বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ শীলু, ডাকল, শুনুন, একটু রুনুকে ডেকে দেবেন?

বাবা পেঙ্গুইন পাখির কলমদান দেখে খুব রাগ করলেন। বাবার পয়সা ছিল না। বলেই হয়তো অহংকার ছিল। শীলুদের পরিবারকে তাঁর একটুও পছন্দ হত না। নিজে আজীবন কষ্ট পেয়েছেন, অন্যের সুখ সে-কারণে সহজভাবে নেওয়ার মানসিকতা তাঁর ছিল না। প্রথম জীবনে ছিলেন স্কুলমাস্টার। প্রাইভেট স্কুল। মাইনের ঠিক ছিল না। আমরা সব তাঁর মাইনের উপর নির্ভর করে আছি দেখে মাস্টারি ছেড়ে ঢুকলেন ফার্মে। বারো বছরে

ক্যাশিয়ার থেকে একাউন্টেন্ট হলেন। মাইনে সাড়ে তিনশ। কলমদানটা ফিরিয়ে দেবার জন্য বাবা পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু রুনু বা মা কেউ সে নিয়ে এগালো না। কলমদানের পেঙ্গুইন পাখিটি ধ্যানী মূর্তির মতো বসে রইল আমার টেবিলে। রাবেয়া শুধু মাঝে মাঝে আমায় বলে, তোমার টেবিলে বলে এটা তোমার মনে কর না, খোকা। আচ্ছা, ইচ্ছে হলে মাঝে মাঝে কলম রেখা।

ঘুমের ঘোরে রুনু বলল, না, পানি খাব না। তারপর আরো খানিকক্ষণ উঁহু উঁহু করল। থানার ঘড়িতে ঢং করে শব্দ হল একটা। সাড়ে-বারো, এক, কিংবা দেড়–যে কোনোটা হতে পারে। আমার আরেকটা সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে হচ্ছে। কে যেন বলেছিল সিগারেটের আনন্দটা আসলে সাইকলজিকেল। তুমি একটা কিছু পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছ, তার আনন্দ। অনেকে আবার বলেন, নিঃসঙ্গের সঙ্গী। এই মধ্যরাতে আমি একলা জেগে আছি, নিঃসঙ্গ তো বটেই। সিগারেটের একটি বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম সিনেমায়। সমস্ত পর্দা অন্ধকার। আবছা আলোয় হলে দেখা গেল বড়ো রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে কে এক জন। চারপাশে কেউ নেই, ভূতুড়ে আবহাওয়া, থমথম করছে। অন্ধকার। পর্দায় লেখা হল; সে কি নিঃসঙ্গ? লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। পর্দায় লেখা হল ঃ না, নিঃসঙ্গ নয়। এই তো তার সঙ্গী। চমৎকার বিজ্ঞাপন। আমার মনে হয়, সিগারেটের নেশার মূল্যের চেয়ে বন্ধুত্বের মূল্য অনেক বেশি।

খুট করে দরজা খোলার শব্দ হল। আমি কান পেতে রইলাম। কে হতে পারে? বাবা নিশ্চয়ই নন, তিনি ওঠেন সাড়াশব্দ করে, দরজা খোলেন ধুমধাম শব্দ করে। মন্টু অথবা মাস্টার কাকা হবেন। টিউবওয়েলে পানি তোলার শব্দ হল অনেকক্ষণ। ছড়ছড়া করে পানি পড়ার আওয়াজ। কুলি করে পানি ছিটাতে ছিটাতে এদিকেই যেন আসছে। হ্যাঁ, মাস্টার

কাকাই। তাঁর মাঝে মাঝে অনেক রাতে ফুলগাছের কাছে চেয়ার পেতে গুনগুন করে গান গাওয়ার শখ আছে। পলা বেঁচে থাকলে প্রথমটায় অপরিচিত জন ভেবে ঘেউঘেউ করত। তারপর গরগর করে পরিচিত জনের অভ্যর্থনা। মাস্টার কাকা বলতেন, কিরে পলু, তোরও বুঝি ঘুম নেই?

আমি কি ললাম, কে?

মাস্টার কাকা বললেন, আমি, খোকা।

কি করেন?

এই বসেছি একটু। যা গরম! তুই ঘুমুস নি এখনো?

জ্বি না।

আসবি নাকি বাইরে?

দরজা খুলে বেরুতেই চোখে পড়ল কাকা বারান্দায় পা ঝালিয়ে বসে আছেন। বললাম, চোয়ারে বসেন। চেয়ার নিয়ে আসি।

না থাক।

আমি তাঁর পাশে বসলাম। গঙ্কম কোথায়? আশ্বিনের শেষাশেষি, একটু শীতই করছে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে। মাস্টার কাকারও বোধকরি মাঝে মাঝে ইনসমনিয়া

হয়। কাকা বললেন, ঘুমুচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। তারপর আর হাজার চেষ্টাতেও ঘুম আসছে না।

আমি বললাম, প্রথম রাত্রিতে ঘুম ভাঙলে এ রকম হয়।

কাকা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটা মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। কাকা খুব নিচু গলায় বললেন, কী মিষ্টি গন্ধ দেখেছিস? আমি যখন শিউলিতলা থাকতাম, তখন স্কুলে যাওয়ার পথে একটা কাঁঠালচাঁপার গাছ পড়ত, ভারি গন্ধ।

আমার, কাকা, কাঠালাচাপার গন্ধ বাজে লাগে। বড়ো বেশি কড়া।

কাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তারা দেখে সময় বলতে পারি। এখন প্রায় দুটো।

আমিও আকাশের দিকে তাকালাম। খুব পরিষ্কার আকাশ। ঝকঝকি করছে তারা।

কাকা বললেন, দেখেছিস কত তারা? খুব যখন তারা ওঠে, তখন দেশে দুর্ভিক্ষ হয় শুনেছি।

আমার শীত করছে। তবু বেশ লাগছে বসে থাকতে।

২. মাস্টার কাকা

মাস্টার কাকাকে খুব ভালো লাগে আমার। অদ্ভুত মানুষ। বয়সে বাবার সমান। বিয়েটিয়ে করেন নি। দুই যুগের বেশি আমাদের সঙ্গে আছেন। কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই। বাইরের কেউ যদিও তা বুঝতে পারে না। বাইরের কেন, আমি নিজেই অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে বাবার আপন ভাই বলেই ভেবেছি। তিনি যে বাবার বন্ধু এবং শুধুমাত্র বন্ধু হয়েও আমাদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গেছেন, তা আচ করতে কষ্ট হয় বই কি। বাবার সঙ্গে মাস্টার কাকার পরিচয় হয় আনন্দমোহন কলেজে। অনেক দিন আগের কথা সে-সব। মার কাছ থেকে শোনা। সরাসরি তো আমরা বাবার কাছ থেকে কিছু জানতে পারতাম না। বাবা মা-কে যা বলতেন, তাই শোনাতেন। আমাদের। মাস্টার কাকাকে বাবা অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন বলেই হয়তো খুঁটিনাটি সমস্তই বলেছেন মাকে।

খুব চুপচাপ ধরনের ছেলে ছিলেন মাস্টার কাকা। ক্লাসে জানালার পাশে একটি জায়গা বেছে নিয়ে সারাক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকতেন। তেমন চোখে পড়ার মতো ছেলে নয়। একটু কুজো, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে রয়েছে, শুকনো দড়ি-পাকান চেহারা। ক্লাসের সবাই ডাকত শকুন মামা বলে। তবু বাবা তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সমস্ত ব্যাপারে তাঁর অদ্ভুত নির্লিপ্ততা আর অঙ্কে অস্বাভাবিক দখল দেখে। তাঁদের ভেতর প্রগাঢ় বন্ধুত্বও হয়েছিল অতি অল্প সময়ে। মাস্টার কাকা বলতেন, দুটি জিনিস আমি ভালোবাসি, প্রথমটি অঙ্ক, দ্বিতীয়টি এস্ট্রলজি। সেই অল্প বয়সেই মাস্টার কাকা নিখুঁত কোষ্ঠি তৈরি করতে শিখেছিলেন।

পরীক্ষার ঠিক আগে-আগে মাস্টার কাকাকে কলেজ ছেড়ে দিতে হল। তিনি একটি বিশেষ ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। যে সময়ের কথা বলছি, সে— সময় খুব কম মেয়েই সায়েন্স পড়তে আসত আনন্দমোহনে। অ্যাডভোকেট রাধিকারঞ্জন চৌধুরীর মেয়ে আনিলা চৌধুরী ছিলেন সব কটি মেয়ের মধ্যে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম।

খুব আকর্ষণীয় চেহারা ছিল, খুব ভালো গাইতে পারতেন, ছাত্রী হিসেবেও অত্যন্ত মেধাবী। কিন্তু তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। কেউ সেধে বলতে এলে ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিতেন। হয়তো কিছুটা অহংকারী ছিলেন। তাঁকে জব্দ করার জন্যই ছেলেরা হঠাৎ করে আনিলা নাম পাল্টে শকুনি মামী বলে ডাকতে শুরু করল! শকুন মামা ও শকুনি মামী। এই নামে পদ্য লিখে বিলি করা হল। মাস্টার কাকা তাঁকে শকুন মামা ডাকায় কিছুই মনে করতেন না। কিন্তু এই ব্যাপারটিতে হকচাকিয়ে গেলেন। অসহ্য বোধ হওয়ায় অনিলা চৌধুরী আনন্দমোহন কলেজ ছেড়ে দেন। তার কিছুদিন পরই সপরিবারে তাঁরা কলকাতায় চলে যান স্থায়ীভাবে। অনিলার প্রতি হয়তো মাস্টার কাকার প্রগাঢ় দুর্বলতা জন্মেছিল। কারণ তিনিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কলেজ ছেড়ে দেন। এরপর আর বহুদিন তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় নি।

প্রায় ছ বছর পর বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হল কুমিল্লার ঠাকুরপাড়ায়, বাবার নিজের বিয়েতে। বাবা চিনতে পারেন নি। মাস্টার কাকা বাবার হাত ধরে যখন বললেন, আমি শরীফ আকন্দ, চিনতে পারছি না? তখন চিনলেন। সময়ের আগেই বুড়িয়ে গেছেন। কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, আরো কুজো হয়ে পড়েছেন। বাবা অবাক হয়ে বললেন, কী আশ্চর্য, আবার দেখা হবে ভাবি নি। এখানে কোথায় থাক তুমি?

তুমি যে-বাড়িতে বিয়ে করেছি, আমি সে-বাড়িতেই থাকি। বাচ্চাদের পড়াই।

বাবা বললেন, আসবে আমার সঙ্গে?

মাস্টার কাকা খুব আগ্রহের সঙ্গে রাজি হলেন। সেই থেকেই তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন। বাবা স্কুলের মাস্টারি যোগাড় করে দিয়েছেন, তাঁর একার বেশ চলে যায় তাতে। তিনি জন্ম থেকেই আমাদের স্মৃতির সঙ্গে গাঁথা। ছোটবেলার কথা যা মনে পড়ে, তা হল–দুর বিছিয়ে বসে বসে পড়ছি। তাঁর ঘরে, রাবেয়াটা হৈচৈ করছে, মাস্টার কাকা পড়াতে পড়াতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলছেন, খোকা হাত মেলে ধরা আমার সামনে, দু হাত।

কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার অন্যমনস্কতা, বিড়বিড় করে কথা বলা। কান পাতলেই শোনা যায় বলছেন, সব ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। বৃত্ত দিয়ে ঘেরা। এর বাইরে কেউ যেতে পারবে না। আমি না, খোকা তুইও না।

বাবার সঙ্গে বিশেষ কথা হত না তাঁর। বাবা নিজে কম কথার মানুষ, মাস্টার কাকাও নির্লিপ্ত প্রকৃতির।

মাস্টার কাকাকে বাইরে থেকে শান্ত প্রকৃতির মনে হলেও তাঁর ভেতরে একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা ছিল। যখন স্কুলে পড়তাম, তখন তিনি এস্ট্রলজি নিয়ে খবু মেতেছেন। কাজকর্মেও তাঁর মানসিক অস্থিরতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। গভীর রাতে খড়ম পায়ে হেঁটে বেড়াতেন। খটখট শব্দ শুনে কত বার ঘুম ভেঙে গেছে, কত বার মাকে আঁকড়ে ধরেছি শুয়ে। মা বলেছেন, ভয় কি খোকা, ভয় কি? ও তোর মাস্টার কাকা।

বাবা তারি। গম্ভীর গলায় ডাকতেন, ও মাস্টার, মাস্টার, শরীফ মিয়া, ও শরীফ মিয়া।

খড়মের খটখটি শব্দটা থেমে যেত। মাস্টার কাকা বলতেন কি হয়েছে?

ছেলে ভয় পাচ্ছে, কী কর এত রাত্রে?

তারা দেখছিলাম। এত তারা আগে আর ওঠে নি। দেখবে?

পাগল! যাও, ঘুমাও গিয়ে।

যাই।

মাস্টার কাকা খড়ম পায়ে খটখট করে চলে যেতেন।

আমাদের সবার পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়েছে তাঁর কাছে। আমি তাঁর প্রথম ছাত্র, তারপর মন্টু। পড়াশোনায় মন নেই বলে রাবেয়ার তো পড়াই হল না। রুনু এখন পড়ে তাঁর কাছে। বাড়িতে তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই তাঁর। থাকলেও যাবার উৎসাহ পান না। অবসর সময় কাটে এস্ট্রলজির বই পড়ে। অঙ্কের মাস্টার হিসেবে এস্ট্রলজি হয়তো ভালোই বোঝেন। মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে বই এনে পড়ি আমি। বিশ্বাস হয়তো করি না। কিন্তু পড়তে ভালো লাগে। আমি জেনেছি মীন রাশিতে আমার জন্ম। মীন রাশির লোক দার্শনিক আর ভাগ্যবান হয়। তাদের জীবন চমৎকার অভিজ্ঞতার জীবন। প্রচুর সুখ, সম্পদ, বৈভব। বেশ লাগে ভাবতে। কাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঐ যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখছি

না? ওর ডান দিকের ছোট্ট তারাটি হল কেতু। বড়ো মারাত্মক গ্রহ। আমার জন্মলগ্নে কেতুর দশা চলছিল!

জানি না, হয়তো জন্মলগ্নে কেতুর দশা থাকলেই আজীবন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়। গভীর রাতে অনিদ্রাতপ্ত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহগুলি পরখ করতে হয়। কাকাকে আমার ভালো লাগে। তার ভিতরে প্রচণ্ড জানিবার আগ্রহটিকে আমি শ্রদ্ধা করি। সামান্য বেতনের সবটা দিয়ে এস্ট্রলজির বই কিনে আনেন। দেশবিদেশের কথা পড়েন। মাঝে মাঝে বেড়াতে যান অপরিচিত সব জায়গায়। কোথায় কোন জঙ্গলে পড়ে আছে ভাঙা মন্দির একটি, কোথায় বাদশা বাবরের আমলে তৈরী গেটের ধ্বংসাবশেষ। সামান্য স্কুলমাস্টারের পড়াশোনার গণ্ডি আর উৎসাহ এত বহুমুখী হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। তিনি মানুষ হিসেবে তত মিশুক নন। নিজেকে আড়াল করার চেষ্টাটা বাড়াবাড়ি রকমের। কোনো দিন মায়ের সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতে দেখি নি। খালি গায়ে ঘরোয়াভাবে ঘরে বসে রয়েছেন, এমনও নজরে আসে নি।

স্কুলে কাকা আমাদের ইতিহাস আর পাটীগণিত পড়াতেন। ইতিহাস আমার একটুও ভালো লাগত না। নিজের নাম হুঁমায়ুন বলেই বাদশা হুঁমায়ুনের প্রতি আমার বাড়াবাড়ি রকমের দরদ ছিল! অথচ আমাদের ইতিহাস বইয়ে ফলাও করেচ শেরশাহের সঙ্গে তাঁর পরাজয়ের কথা লেখা। শেরশাহ আবার এমনি লোক, যে গ্র্যাণ্ডটাঙ্ক রোড করিয়েছে, ঘোড়ার পিঠে ডাক চালু করিয়েছে। কিন্তু এত করেও ক্লাস সেতেনের একটি বাচ্চা ছেলের মন জয় করতে পারে নি। পরীক্ষার খাতায় তাঁর জীবনী লিখতে গিয়ে আমার বড়ো রকমের গ্লানি বোধ হত। সেই থেকেই সমস্ত ইতিহাঁসের ওপরই আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। কাকা

তা জানতেন। এক দিন আমায় বললেন, খোকা তোর প্রিয় বাদশা হুমায়ূনের কথা বলব তোকে, বিকেলে ঘরে আসিস।

সেই দিনটি আমার খুব মনে আছে। কাকা আধশোয়া হয়ে তাঁর বিছানায়, আমি পাশে বসে, রুনু আর মন্টু সেই ঘরে বসে-বসে লুডু খেলছে। কাকা বলে চলেছেন, হুঁমায়ুন সম্পর্কে কে এক জন ছোট্ট একটি বই লিখেছিলেন-হুমায়ূন নামা। বইটিতে হুঁমায়ুনকে তিনি বলেছেন দুভাগ্যের অসহায় বাদশা। কিন্তু এমন দুভাগ্যবান বাদশা হতে পারলে আমি বিশ্ববিজয়ী সিজার কিংবা মহাযোদ্ধা নেপোলিয়ানও হতে চাই না। যুদ্ধ বন্ধ রেখে চিতোরের রাণীর ডাকে তাঁর চিতোর অভিমুখে যাত্রা, ভিত্তিওয়ালাকে সিংহাসনে বসোনর পিছনে কৃতজ্ঞতার অপরূপ প্রকাশ। গান, বই আর ধর্মের প্রতি কি আকর্ষণ! আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। যেখানে আজান শুনে হুমায়ূন লাইব্রেরি থেকে দ্রুত নেমে আসছেন নামাজে সামিল হতে, নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন, সে-জায়গায় আমার চোখ ছলছল করে উঠল। কাকা বললেন, বড়ো হৃদয়বান বাদশা, সত্যিকার কবি হৃদয় তাঁর। আমার মনে হল আমিই যেন সেই বাদশা। আর আমাকে বাদশা বানানর কৃতিত্বটা কাকার একার।

আজ এই আশ্বিনের মধ্যরাত্রি, কাকা বসে আছেন ঠাণ্ডা মেঝেতে। অল্প অল্প শীতের বাতাস বইছে। জোছনা ফিকে হয়ে এসেছে। এখনি হয়তো চাঁদ ডুবে চারদিক অন্ধকার হবে। আমার সেই পুরনো কথা মনে পড়ল। আমি ডাকলাম, কাকা, কাকা।

কি।

অনেক রাত হয়েছে, ঘুমুতে যান।

যাই।

কাকা মন্থর পায়ে চলে গেলেন। আমি এসে শুয়ে পড়লাম। রাবেয়া ঘুমের মধ্যেই চেঁচাল, আম্মি আম্মি।

আমার মনে পড়ল রাবেয়া এক দিন হারিয়ে গিয়েছিল। চৈত্র মাস। দারুণ গরম। কলেজ থেকে এসে শুনি রাবেয়া নেই। তার যাবার জায়গা সীমিত। অল্প কয়েকটি ঘরবাড়িতে ঘুরে বেড়ায় সে। দুপুরের খাবারের আগে আসে; খেয়েদেয়ে অল্প কিছুক্ষণের ঘুম। তারপর আবার বেরিয়ে পড়া। সেদিন সন্ধ্যা উৎরেছে, রাবেয়া আসে নি। মার কান্না প্রায় বিলাপে পৌচেছে। মন্টু দুপুর থেকেই খুজছে। বাবা হতবুদ্ধি। একটি অপ্রকৃতিস্থ সুন্দরী যুবতী মেয়ের হারিয়ে যাওয়াটা অনেক কারণে বেদনাদায়ক। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাকে কি আবার ফিরে পাওয়া যাবে? রুনু চুপচাপ শুয়ে আছে তার বিছানায়। তার দুঃখপ্রকাশের ভঙ্গিটা বড়ো নীরব। এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা রুনুর ছোট শরীরটা একটা অসহায়তারই প্রতীক। আমায় দেখে রুনু উঠে বসল। বলল, কি হবে দাদা?

তার চোখের কোণে চব্বিশ ঘণ্টাতেই কালি পড়েছে। আমি বললাম, পাওয়া যাবে রুনু, ভয় কি?

কিন্তু ও যে ঠিকানা জানে না। কেউ যদি ওকে খুঁজে পায়, ও কি কিছু বলতে পারবে?

সে কিছুই বলতে পারবে না। তার বড়ো বড়ো চোখে সে হয়তো অসহায়ের মতো তাকাবে। মেলায় হারিয়ে যাওয়া ছোট খুঁকির মতো শুধুই বলবে, আমি বাড়ি যাব। আমি বাড়ি যাব। সে বাড়ি যে কোথায়, তা তার জানা নেই।

রুনু আবার বলল, দাদা, ও যদি কোনো বাজে লোকের হাতে পড়ে?

রুনু বুঝতে শিখেছে। মেয়েদের মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয় ছেলেদেরও আগে। তারা তাদের কচি চোখেও পৃথিবীর নোংরামি দেখতে পায়। সে নোংরামির বড়ো শিকার তারাই। তাই প্রকৃতি তাদের কাছে অন্ধকারের খবর পাঠায় অনেক আগেই।

রাবেয়া ফিরে এল রাত আটটায়। সঙ্গে মাস্টার কাকা। বুকের উপর চেপে-বসা দুশ্চিন্তা নিমিষেই দূর হল। মাস্টার কাকা বললেন, ওকে আমি স্কুলের কাছে পাই, হারিয়ে গেছে তা আমি জানতাম না। এসব শোনার উৎসাহ আমার ছিল না। পাওয়া গেছে এই যথেষ্ট। স্কুলঘরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, মাস্টার কাকাকে দেখে দৌড়ে রাস্তা পার হল, আরেকটু হলেই গাড়িচাপা পড়ত। এ সবে এখন আর আমাদের উৎসাহ নেই। বাবা পরপর দু দিন রোজা রাখলেন।

খোকা, ও খোকা।

কি?

বাতি জ্বাল।

কেন?

আমার বাথরুম পেয়েছে।

বারেয়া মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। আমি বললাম, বাতি জ্বালাতে হবে না। আয়, বারান্দায় আলো আছে।

না, জ্বাল।

দেশলাই খুঁজে হ্যাঁরিকেন জ্বালালাম। দরজা খুলতেই ওঘর থেকে মা বললেন, কে? শেষরাতের দিকে মায়ের ঘুম পাতলা হয়ে আসে।

আমরা মা, রাবেয়া বাথরুমে যাবে।

বারান্দায় এসে রাবেয়া হাই তুলল। বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, কি চনমনে গন্ধ ফুলের, না?

হুঁ। ফুলের গন্ধ তোর ভালো লাগে, রাবেয়া?

না, বাজে।

বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বলল, পলা কবে আসবে, খোকা?

পলার সঙ্গে তার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। মাঝে মাঝেই পলার কথা জানতে চায়। কে জানে কুকুরটা যে কিসের দুঃখে বিবাগী হল।

আজ রাতেও এক ফোঁটা ঘুম হবে না। দু মাস পরেই পরীক্ষা, এক রাত্রি ঘুম না-হলে পরপর দু দিন পড়া হয় না। বুঝতে পারছি কোন ফাঁকে মশা ঢুকেছে। কয়েকটা। কেবল গুনগুন করছে। কানের কাছে। কান অথবা মুখের নরম মাংস থেকে এক ঢোক করে রক্ত না-খাওয়া পর্যন্ত এ চলতেই থাকবে। পাখা করে মশা তাড়াবার ইচ্ছে হচ্ছে না। বালিশে মাথা গুঁজে ঘুমের জন্যে প্রাণপণে আমার সমস্ত ভাবনা মুছে ফেলতে চাইলাম।

হঠাৎ করেই অনেকটা আলো এসে পড়ল ঘরে। শীলুদের বারান্দার এক শ ওয়াটের বাঘাটা জ্বলিয়েছে। কেউ। কে হতে পারে? শীলুর বাবা না। নাহার ভাবী? শীলু কিংবা তার মাও হতে পারে। শীলুর মা চমৎকার মহিলা। এক বার এসেছিলেন আমাদের ঘরে।

শীলুর মা, যিনি সন্ধ্যায় লিনে বসে শীলুর বাবার সঙ্গে হেসে হেসে চা খান, বিকেলে প্রায়ই হারুন ভাই-এর পার্টনার হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্যাডমিন্টন খেলেন, যাঁর একটি গাঢ় সবুজ শাড়ি আছে, যেটি পরলে তাঁর বয়স দশ বৎসর কম মনে হয়, তিনি এক দিন এসেছিলেন আমাদের বাসায়। সেদিন ছিল শুক্রবার। রুনুর স্কুল বন্ধ ছিল, বাবা ছিলেন অফিসে। শীলুর মা লাল বুটি দেওয়া হালকা নীল শাড়ি পরেছিলেন। সোনালি ফ্রেমের চশমায় তাঁকে কলেজের মেয়ে-প্রফেসরের মতো দেখাচ্ছিল। আমার মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কী করে যত্ন করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন। না। আর শীলুর মা? তিনি মূর্তির মতো অনেকক্ষণ বসে থেকে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তিনি থেমে থেমে প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে বলেছিলেন, হারুনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনার মেয়ে রাবেয়াকে বিয়ে করতে চায়।

আমরা সবাই চুপ করে রইলন। তিনি বলে চললেন, আপনার মেয়েকে পাঠাবেন না ওখানে। কি করে সে ছেলের মন ভুলিয়েছে! মাথার ঠিক নেই একটা মেয়ে। ছি! মা লজ্জায় কুকড়ে গেলেন।

রাবেয়া অকারণে মার খেল সেদিন। সব শুনে বাবার মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। কেন সে যাবে হ্যাংলার মতো? রাগিলে বাবার মাথার ঠিক থাকে না। বয়স্কা আধপাগলা একটা মেয়েকে তিনি উন্মাদের মতোই মারলেন। রাবেয়া শুধু বলছিল, আমি আর করব না। মারছ কেন? বললাম তো আর করব না।

কী জন্যে মরা খাচ্ছিল তা সে নিশ্চয়ই বুঝছিল না। বারবার তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। মা নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। আর আশ্চর্য, কান্না শুনে প্রথম বারের মতো হারুন ভাই এলেন আমাদের বাসায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি অল্প অল্প কাঁপিছিলেন। তাঁর চোখ লাল। তিনি থেমে থেমে বললেন, ওকে মারছেন কেন?

বাবা তাকালেন হারুন ভাই-এর দিকে। আমিও ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলাম। হঠাৎ তাঁর আমাদের এখানে আসা আমাদের ঠাট্টা করার মতোই মনে হল। রাবেয়া বলল, দেখুন না, আমাকে মারছে শুধু শুধু।

হারুন ভাই-এর ফ্যাকাশে মুখে আমি স্পষ্ট গভীর বেদনার ছায়া দেখেছিলাম। তবু কঠিন গলায় বললাম, আপনি বাসায় যান। আপনি এসছেন কেন?

শীলুদের বাসার জানালায় শীলু আর তার মা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

রাবেয়াকে কদিন চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখা হল। তার দরকার ছিল না, হারুন ভাই-এর বিয়ে হল নাহার ভাবীর সঙ্গে। তাঁর খালাতো বোন, হোম ইকনমিক্সে বি. এ. পড়তেন। হারুন ভাই জার্মানী চলে গেলেন কেমিকেল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিগ্রী নিতে। আগেই সব ঠিক হয়ে ছিল।

নাহার ভাবী সমস্তই জেনেছিলেন। বিয়ের সাত দিন না পেরুতেই তিনি আমাদের বাসায় এসে সবার সঙ্গে গল্প করলেন। রাবেয়াকে নিয়ে গেলেন তাঁদের বাসায়। রাবেয়া হাতে হলুদ রঙের একটা প্যাকেট নিয়ে হাসতে হাসতে বাসায় ফিরল।

মা দ্যাখো, ঐ মেয়েটি আমায় কী সুন্দর একটা শাড়ি দিয়েছে। আমি চাই নি, ও আপনি দিলে।

রাবেয়া নীল রঙের একটা শাড়ি আমাদের সামনে মেলে ধরল। চমৎকার রং। অদ্ভুত সুন্দর।

কাক ডাকল। ভোর হচ্ছে বুঝি। কোমল একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আযান হল। মাঠের ওপারে ঝাঁকড়া কাঁঠালগাছের জমাট-বাঁধা অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। বাঁশের বেড়ার উপর হাত রেখে নাহার ভাবী খালি পায়ে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। খুব সকালে ঘুম ভাঙে তাঁর। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন অল্প, বললেন, আজ দেখি খুব ভোরে উঠেছেন।

আমি চুপ করে রইলাম, হ্যাঁ-বাচক মাথা নড়লাম একটু।

নাহার ভাবী বললেন, রাতে আপনার গান বাজিয়েছিলাম, শুনেছেন?

জ্বি, শুনেছি।

রুনুর পছন্দ-করা গান। সেই সাজিয়ে দিয়েছিল। রুনু ঘুমুচ্ছে এখনো?

জ্বি।

ডেকে দিন একটু, খালি পায়ে বেড়াবে শিশিরের ওপর। চোখ ভালো থাকে।

রুনু রাবেয়ার গলা জড়িয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আমি ডাকলাম রুনুরুনু।

৩. মা

কদিন ধরেই দেখছি মা কেমন যেন বিমর্ষ। বড়ো ধরনের কোনো রোগ সারবার পর যেমন সমস্ত শরীরে ক্লান্তির ছায়া পড়ে, তেমনি। বয়স হয়েছে, ভাঙা চাকার সংসার টেনে নিতে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, দেহ মন শ্রান্ত তো হবেই। তবু তাঁর এমন অসহায় ভাবটা আমার ভালো লাগে না। খুব শিগগিরই হয়তো আমি একটি ভালো চাকরি পাব। আমি সবাইকে পরিপূর্ণ সুখী করতে চাই। মাকে নিয়ে একবার সীতাকুণ্ড বেড়াতে যাব। কলেজে যখন পড়ি, তখন কবন্ধুকে নিয়ে এক বার গিয়েছিলাম। এত সুন্দর, এত আশ্চর্য! চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে দূরে সমুদ্র দেখা যায়। মা নিশ্চয়ই চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠতে পারবেন না। মা আর বাবাকে নিচে রেখে আমরা সবাই উপরে উঠব। বাবাও হয়তো উঠতে চাইবেন। ঠিক সন্ধ্যার আগে-আগে উঠতে পারলে সূর্যস্ত দেখা যাবে! রেকর্ডপ্লেয়ার নেব, অনেক রেকর্ডও নিয়ে যাব।

খোকা, ও খোকা।

কি মা।

কিছু না, গল্প করি তোর সাথে, আয়!

বসেন, সারা দিন তো কাজ নিয়েই থাকেন।

কই আর কাজ?

আপনার স্বাস্থ্য খুব ভেঙে গেছে, মা।

আর স্বাস্থ্য!

মা বসলেন আমার সামনে। তাঁর চোখের কোণে গাঢ় কালি পড়েছে। তিনি থেমে থেমে বললেন, কাল রাতেও আমার ঘুম হয় নি, খোকা।

আমায় ডাকলেন না কেন, ওষুধ ছিল তো আমার কাছে।

দু বার ডেকেছি, তুই ঘুমুচ্ছিলি।

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আমার খুব ঘুম বেড়েছে দেখছি। রাত নটা বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ি, উঠি পরদিন আটটায়। মা বললেন, রাবেয়াকে নিয়ে তোর বড়ো খালার কাছে একবার যাব।

হঠাৎ কী ব্যাপার?

এমনি-ঘুরে আসি একটু।

কোনো পীরেব খোঁজ পেয়েছেন বুঝি?

মা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আমি দেখলাম, মার নাকের পাতলা চামড়া তিরতির করে কাঁপছে। মাকে আমার হঠাৎ খুব ছেলেমানুষ মনে হল। বললাম, রাত-দিন কী এত ভাবেন?

কই, কিছু ভাবি না তো। চা খাবি এক কাপ?

এই দুপুরে।

খাঁ না। আগে তো খুব চা চাইতি।

মা উঠে চলে গেলেন। মার ভিতর একটা স্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে। শরীর সুস্থ নয় নিশ্চয়ই। মাকে এক জন বড়ো ডাক্তার দেখালে হত। রুনুর স্কুল ছুটি হয় সাড়ে চারটায়। আজ সে দুপুরেই হাজির। হাসতে হাসতে বলল, স্কুল ছুটি হয়ে গেল দাদা।

সকাল সকাল যে! কি ব্যাপার?

মনিং স্কুল আজ থেকে। সকাল সাতটায় স্কুলে গেলাম। তুমি তো তখন ঘুমে। বার্বাহ্, এত ঘুমুতেও পার।

মা চা নিয়ে ঢুকলেন। রুনু বলল, আমায় এক কাপ দাও না মা।

আরেকটা কাপ এনে ভাগ করে নে।

না, তা হলে থাক। দাদা খাক।

আহা, নে না।

রুনু চা নিয়ে বসল একপাশে। চুমুক দিতে কী ভেবে হাসল খনিকক্ষণ। বলল, মা খিদে পেয়েছে, কি রানা মা আজকে?

মাছ। খিদে নিয়ে চা খেতে আছে?

ওতে কিছ হবে না, মা। আচ্ছা, আপাকে দেখলাম বাবার সঙ্গে রিকসা করে যাচ্ছে। কোথায়?

কি জানি কোথায়। তোর আম-কাঁঠালের বন্ধ করে রুনু।

দেরি আছে, সামনের মাসের পনের তারিখ থেকে।

আমি তোর খালার বাসায় যাব বেড়াতে। তুই তাহলে থাকবি?

সে কি, তোমার সঙ্গে কে কে যাবে মা?

আমি, রাবেয়া আর তোর আব্বা।

বেশ তো! আমি বুঝি বাতিল?

রুনুর কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেললাম। সবাই। রুনু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদা, তোমার চাকরি হলে আমায় নিয়ে বেড়াতে যাবে?

নিশ্চয়ই।

আমি কিন্তু কক্সবাজার যাব। শীলুরা গিয়েছিল গত বার।

বেশ তো।

আর যেদিন প্রথম বেতন পাবে সেদিন—

সেদিন কি রুনু?

সেদিন আমাকে দশ টাকা দিতে হবে। দেবে তো?

হ্যাঁ, কী করবি?

এখন বলব না।

রুনু লম্বা হয়েছে একটু, চোখের তারাও যেন মনে হয় আরো গভীর কালো। চাঞ্চল্যও এসেছে একটু। সেদিন দেখলাম অনেকক্ষণ ধরেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আচড়াল। সে কি বুঝতে পারছে তার চোখের পাতায়, তার হলুদ গালে, বরফিকাটা মসৃণ চিবুকে রূপের বন্যা নামছে। যৌবনের সেই লুকান চাবি দিয়ে প্রকৃতি একটি একটি করে অজানা ঘর খুলে দিচ্ছে তার সামনে। সে দেখছি প্রায় রাতেই শুয়ে শুয়ে উপন্যাস পড়ে। পড়তে পড়তে এক এক বার চোখে রুমাল দিয়ে কেঁদে ওঠে। আমি বলি, কী হয়েছে রুনু?

কই, কিছুই তো হয় নি।

কাঁদছিস কেন?

কাঁদছি, না তো।

কি বই পড়ছিলি দেখি।

রুনু উঁচু করে বই দেখায়। কেঁদে ভাসাবার মতে, কিছু নয়। জীবনে একটি সময় আসে যখন তীব্র অনুভূতিতে সমস্ত আচ্ছান্ন হয়ে থাকে। প্রথম বেতন পেলে রুণুকে একটা চমৎকার শাড়ি কিনে দেব আমি। সবুজ জমিনের উপর সাদা ফুলের নকশা। রোল নাম্বারা থাটিন পর্যন্ত দেখতাম।

অনেক দিন পর শীলুকে দেখলাম। সবাই মিলে চাটগায় গিয়েছিল বেড়াতে। বেশ কিছু দিন পর ফিরল। এত দিন শান্তি কটেজকে কি বিষণ্ণই না লাগছিল। দেখতাম সন্ধ্যা হতেই শান্তি কটেজের বুড়ো দারোয়ান বারান্দায় বাতি জ্বলিয়ে একা একা বসে চুপচাপ। খালি বাড়ি পেয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি খেলতে হাজির হচ্ছে সকাল-বিকাল।

ফুলগাছ নষ্ট করো না গো, ও লক্ষী ছেলেমেয়েরা।

প্রতিবাদের সুরও যেন খালি খাড়ির মতোই বিষন্ন। মাঝে মাঝেই ঝড়ের মতো হাজির হোত রাবেয়া। গেটের বাইরে থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাত–এই দারোয়ান এই, এই বুড়ো।

কি খুকি। আপা?

এরা কোথায় গেছে?

বেড়াতে।

কোন বেড়াতে গেল?

দারোয়ান হাসত কথা শুনে। আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলত, আবার আসবে আপামণি।

কবে আসবে? কাল?

ষোল তারিখে আসবে।

না, কালকেই আসতে হবে। তুমি ওদের আনতে যাবে ইষ্টিশনে?

জ্বি, আপামণি।

আমিও সঙ্গে যাব।

আচ্ছা।

তুমি নিয়ে যাবে তো আমাকে?

জ্বি, আপনাকে নিয়ে যাব, ঠিক যাব। আপামণি।

পেয়ারা পেড়ে দাও আমাকে।

লম্বা আকশি নিয়ে খুশি মনে পেয়ারা খোঁজে বুড়ো। গ্যারেজের উপর ঝাঁকেপড়া গাছে ঝোপে পেয়ারা হয়েছে।

খালি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আমিও রাবেয়ার মতো আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। কবে আসবে শীলু, যাকে আমি করুণা বলে নিজের মনেই ডাকি। করুণা ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে বাগানে, নিজের খেয়ালে গান গেয়ে উঠবে আচমকা। আমাদের বাসার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় ডাকবে, রুনু, রুনু, বাসায় আছ?

এর জন্যে আমি অপেক্ষা করে ছিলাম। ভালোবাসা সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু আমি বুকের ভেতর গোপন ভালোবাসা পুষেছি।

কত দিন পর দেখলাম শীলুকে।

গাড়ি থেকে নামতেই আমার সঙ্গে দেখা। খুব কোমল কণ্ঠে বলল, আপনারা সব ভালো ছিলেন তো? রুনু ভালো?

তেমনি লম্বাটে মুখ, কপালের দিকে টানা ভুরু, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ থমকে অন্য দিকে তাকাল। আমার হৃৎপিণ্ড দুলে উঠল, শীলুর চোখের দিকে সরাসরি তাকাতে গিয়ে অদ্ভুত কষ্ট হল। আমি বললাম, তোমরা ভালো তো শীলু?

জ্বি।

শীলুর মা মালপত্র নামাতে নামাতে আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে। বুড়ো বয়সেও ঠোঁটে আর মুখে রং মেখেছেন। বয়স অগ্রাহ্য করে পরা চকচকে শাড়িতে তাঁকে হাস্যকর লাগছিল, কিন্তু তবু তিনি শীলুর মা, আমি বিনীত ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

সবার শেষে নামলেন নাহার ভাবী। ভারি সুন্দর হয়েছেন তিনি। গায়ের মসৃণ চামড়া ঝকঝকি করছে। নাকের উপর জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ঘাম চিকচিক করছে। রোদ লোগে। নাহার ভাবী আমাকে দেখে ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলেন, আপনাদের কথা যা ভেবেছি।

আমিও ভেবেছি।–আপনারা কবে যে আসবেন!

রুনু আর রাবেয়া কোথায়?

রুনু স্কুলে। রাবেয়া বেড়াতে বের হয়েছে।

রুনুর জন্যে আমি অনেক গল্পের বই এনেছি। অনেক নতুন রেকর্ড কিনেছি।

শীলুর মা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, রোদে তোমাদের মাথা ধরবে, ভেতরে গিয়ে বস, মেয়েরা।

শীলু, তোমাকে আমি গোপনে করুণা বলে ডাকি। তোমার জন্যে আমার অনেক কিছু করতে ইচ্ছে হয়। প্রতি রাতে তোমাকে নিয়ে কত কি ভাবি। যেন তোমার কঠিন অসুখ করেছে। শুয়ে শুয়ে দিন গুনছ মৃত্যুর। হঠাৎ এক দিন আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তোমার বিছানার পাশে। তুমি ছেলেমানুষের মতো বললে, এত দিন পরে এলেন?

আমি বললাম, তুমি তো আমায় কখনো ডাক নি শীলু। ডাকলেই আসতাম। তুমি বিবর্ণ ঠোঁটে হাসলে। আমি বসলাম তোমার পাশে। জানালা দিয়ে হুঁহু করে হাওয়া আসছে। হাওয়ায় কাঁপছে তোমার লালচে চুল। আমি তোমার মাথায় হাত রাখলাম। তুমি বললে জানেন আমার যে একটি ময়না ছিল। সেটি ঠিক মানুষের মতো শিস দিত, খাঁচা ভেঙে পালিয়েছে।

কী হাস্যকর ছেলেমানুষী ভাবনা! কত দিন ভাবতে-ভাবতে রাত হয়ে যেত। রাস্তায় নিশি-পাওয়া কুকুর চেঁচাত। ঘুম ভেঙে মাস্টার কাকা উঠে আপন মনে কথা বলতেন।

আমার বন্ধু রমিজ এক বিবাহিতা ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেছিল। মেয়েটি তার স্বামী ও দুটি বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল রমিজের সঙ্গে। ভদ্রমহিলার স্বামী দুঃখে লজ্জায় এন্ড্রিন খেয়ে মরেছিল। ঘটনাটি শুনে রমিজের প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হয়েছিল। এর অনেক দিন পর যখন শীলুরা ঘর অন্ধকার করে বাইরে বেড়াতে গেল, তখন কেন যেন মনে হল।রামিজ কোনো দোষ করে নি।

ভালোবাসার উৎস কী আনি জানি না। আশফাক বলত, ভালোবাসা হচ্ছে নিছক কামনা, যৌন আকর্ষণের পরিভাষা। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার গলা জড়িয়ে শীলু কখনো ঘুমিয়ে থাকবে।–এ ধরনের কল্পনা তো কখনো মনে আসে না।

একদিন শীলুর বয়স হবে। পাক ধরবে তার চুলে, পোকায় কাটা অশক্ত দাঁতে কালো ছোপ পড়বে, ছানি-পড়া চোখের ঝাপসা দৃষ্টিতে তখন কি সে দেখতে পারবে বছর ত্রিশোক আগে

একটি অনুভূতিপ্রবণ তরুণ ছেলে কান পেতে আছে কখন সেই কোমল কণ্ঠ শোনা যাবে, দাদু ভাই, রুনু বাসায় আছে?

আমি ইদানীং কেমন আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছি। মা আমাকে মাঝে মাঝে বুঝতে চেষ্ট করেন। রুনু প্রায়ই অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো আমার বোঝার ভুল। তবু তার হাবভাব যেন কেমন। যেন কিছু জানতে চেষ্ট করছে। সেদিন অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে বসল, শীলুকে কি তোমার খুব বুদ্ধিমান বলে মনে হয়, দাদা ভাই?

আমি নিজেকে যথেষ্ট স্বাভাবিক রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে বললাম, হ্যাঁ।

তোমার কাছে ওকে ভালো লাগে?

তা লাগে।

কিন্তু, ও কী বলে জান?

কী বলে?

বলে তোমার দাদাভাইকে দেখলেই মনে হয় বোকা, তাই না?

বলা বাহুল্য আমি সেদিন দুঃখিত হয়েছিলাম। আমাকে কেউ বোকা বলছে, সেই জন্যে নয়। আমার গভীর আবেগের কথা সে জানছে না, এই জন্যে। আমার ধারণা, শীলু। যখন সমস্ত কিছু জানবে, তখন নিশ্চয়ই আমাকে অন্য চোখে দেখবে। আমি বললাম, শুনে তোর খারাপ লেগেছে, রুনু?

হ্যাঁ।

শীলু কি তোর খুব ভালো বন্ধু?

হ্যাঁ, ভালো বন্ধু।

৪. আমাদের সংসার

আমাদের সংসারে কী–একটা পরিবর্তন এসেছে। সুর কেটে গেছে কোথাও। শীলু আমার সমস্ত চেতনা এমনভাবে আচ্ছান্ন করে রেখেছে যে, আমি ঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। মা ভীষণরকম নীরব হয়ে পড়েছেন। শঙ্কিতভাবে চলাফেরা করছেন। তাঁর হতাশ ভাবভঙ্গি, নিচু সুরে টেনে–টেনে কথা বলা সমস্তই বলে দেয় কিছু একটা হয়েছে। বাবা এসে প্রায়ই আমার ঘরে বসেন। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় দু— একটি কথাবার্তা বলেন : কেমন পড়াশোনা চলছে? বাজারের জিনিসপত্রের যা দাম!

আমি তাঁর ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারি, তিনি কিছু একটা বলতে চান। এলোমেলো কথা বলতে-বলতে এটি সেটি নাড়তে থাকেন, তারপর হঠাৎ করে উঠে চলে যান। কী বলতে চান তা বুঝে উঠতে পারি না। বাবাকে আমরা বড়ো ভয় পাই, নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাই না। মাকে যখন জিজ্ঞেস করি, কি হয়েছে মা? মা অবাক হবার ভান করে বলেন, হবে। আবার কি রে খোকা?

মা মিথ্যা বলতে পারেন না, কিছু লুকোতে পারেন না। আমি জোর দিয়ে বলি, বল, কী হয়েছে?

মা মেঝের দিকে তাকিয়ে টানা সুরে কাঁপা গলায় বললেন, কোথায় কি হায়েছে?

অথচ প্রায়ই দেখছি বাবা আর মা ফিসফিস করে আলাপ করছেন। বিরক্তিতে বাবার ভ্রূ কুঁচকে উঠছে ঘন ঘন। অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে বসে থাকছেন। পরশু রাতে মা গুনগুন

করে কাঁদছিলেন। আমার কাছে মনে হচ্ছিল, কে যেন ইনিয়েবিনিয়ে গান গাইছে। রাবেয়া বলল, ও খোকা, ও ঘরে মা কাঁদছে রে।

রুনু বলল, সত্যি দাদা, মা কাঁদছে। আমি ভেবেছি–বুঝি বেড়াল।

রাবেয়া গলা উঁচু করে ডাকল, মা, ও মা, কাঁদছ কেন?

মা চুপ করে গেলেন। রাবেয়া আবার ডাকল, মা, ও মা!

মা ধারা— গলায় বললেন, কি?

তুমি কাঁদছিলে কেন?

আমি সমস্ত কিছু বুঝতে চাই। আমি সবাইকে ভালোবাসি। যে-সংসার বাবা গড়ে তুলেছেন, সেখানে আমার যা ভূমিকা, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি করতে চাই। যদি কোনো জটিলতা এসেই থাকে, তবে সে-জটিলতা থেকে আমি দূরে থাকতে চাই না। আমি চাই সবাই সুখী হোক। রুনুশীলুর মতো একটি ময়না এনে পুষুক, যেটি সময়ে-অসময়ে মানুষের মতো সুখের শিস দিয়ে উঠবে।

দুপুরবেলা ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ রাবেয়া আমায় ডেকে তুলল। উত্তেজনায় তার চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপছে।

ও খোকা, শুনছ, আমার বিয়ে।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তোকালাম? রাবেয়া খিলখিল করে হেসে বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না? আল্লার কসম, সত্যি বিয়ে, আম্মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

কখন বিয়ে?

আজ বিকেলে। এখন আমি গোসল করে সাজব! তুমি আবার সবাইকে বলে বেড়িও না খোকা, আমার বুঝি লজ্জা নেই?

মাকে জিজ্ঞেস করতেই মা বললেন, বরপক্ষের ওরা বিকেলে দেখতে আসবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, পাগল মেয়েকে বিয়ে করবে কে?

মা বললেন, পাগল কোথায় রে, ঐ একটু যা আছে তা সেরে যাবে।

বরপক্ষের লোকজন জানে?

মা ভীত কণ্ঠে বললেন, আমি ঠিক বলতে পারি না তোর আরা বলেছে কি না। তুই আপত্তি করিস না খোকা।

কিন্তু হঠাৎ বিয়ের কী হল?

আমি জানি না। তোর আর। শাল ঠিক করেছেন। তোর আরাকে জিজ্ঞেস কর।

দেখতে আসবে পাঁচটায়, চারটার ভিতরেই সব তৈরি হয়ে গেল। মা ঘামতে ঘামতে খাবার তৈরি করলেন। বসবার ঘরে নতুন পর্দা লাগান হল; ট্রাঙ্কে তোলা টেবিল-ক্লথ বিছিয়ে দেয়া হল টেবিলে। মন্টু সাইকেলে করে দূর কোথাও থেকে ফুল এনে ফুলদানি সাজাল। রুনু রাবেয়ার একটি শাপলা রঙের শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাবেয়া ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল, মা, রুনু যে বড়ো আমার শাড়ি পরেছে, ময়লা করে ফেলবে তো।

ময়লা হলে ইস্ত্রি করিয়ে দেব।

যদি ছিঁড়ে ফেলে?

কি ভ্যাজর ভ্যাজার করছিস।

হুঁ, আমি তো ভ্যাজর ভ্যাজর করছি। আমার যদি আজ বিয়ে না হত, দেখতে রুনুর চুল ছিঁড়ে ফেলতাম না!

রাবেয়া পরেছে বেশ দামী আসমানী রঙের শাড়ি। সাধারণ সাজগোজের বেশি। কিছু করে নি। এতে তাকে যে এত সুন্দরী লাগবে, কে ভেবেছে! বড়ো বড়ো ভাসা চোখ, বরফি-কাটা চিবুক, শিশুর মতো চাউনি। সব মিলিয়ে রূপকথার বইয়ে আকা বন্দী রাজকন্যার ছবি যেন।

মাস্টার কাকা একটা ফর্সা পাঞ্জাবি পরে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন, বরপক্ষীয়দের অভ্যর্থনার জন্য। পাঁচটায় তাদের আসার কথা, ছটা পর্যন্ত কেউ এল না। ঠিকানা নিয়ে

মাস্টার কাক খুঁজতে গেলেন। জানা গেল কেউ আসবে না। একটি পাগল মেয়ে গছিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র তারা কী করে যেন জেনেছে।

লজ্জায় আমার চোখে পানি এসে পড়ল। কী দরকার ছিল এ সবের? না-ই হত বিয়ে। মা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, দরকার ছিল রে।

কী জন্যে?

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় খোকা!

কী সন্দেহ?

কাল তোর বাবা রাবেয়াকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে, তখন জানবি।

বাবা নামলেন রিকসা থেকে। রাবেয়া ধীরে-সুস্থে নামল। মুখ কালো করে বলল, মা, ডাক্তার আমাকে বেশি পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছেন। এখন শুধু বিশ্রাম। তাই না বাবা?

বাবা মার দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, এখন কী করবে?

ব্যাপারটা আমি জানলাম। রুনু জানল। মন্টু ফুটবল খেলতে বাইরে গেছে, শুধু সে-ই জানল না। রাবেয়ার নির্বিকার ঘুরে বেড়ানর ফল ফলেছে। ডাক্তার তাকে পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছেন। এখন রাবেয়ার প্রয়োজন শুধু বিশ্রাম।

রাবেয়ার মাথার ঠিক নেই। ছোটবেলা থেকেই সে ঘুরে বেড়াতে চারদিকে। সব বাড়িঘরই তার চেনা। চাচা খালু দাদা বলে ডাকে আশেপাশের মানুষদের। তাদের ভিতর থেকেই কেউ তাকে ডেকে নিয়েছে। এমন একটি মেয়েকে প্রলুব্ধ করতে কী লাগে? মোর রাত্রে ঘুম হয় না। তাঁর চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। রুনু আর শীলুদের বাসায় গান শুনতে যায় না। নাহার ভাবী বেড়াতে এসে বললেন, কি ব্যাপার, তোমরা কেউ দেখি আমাদের ওখানে যাও না, রাবেয়া পর্যন্ত না।

রুনু কথা বলে না। মা নিচু গলায় বলেন, রাবেয়ার অসুখ করেছে মা।

কি অসুখ, কই জানি না তো?

এমনি শরীর খারাপ।

বলতে গিয়ে মায়ের কথা বেধে যায়। অসহায়ের মতো তাকান।

ব্যাপারটার উৎস রাবেয়ার কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করলাম। আমি। সন্ধ্যায় যখন রুনু মাস্টার কাকার কাছে পড়তে যায়, ঘরে থাকি আমি আর রাবেয়া। তখনই আমি কথা শুরু করি :

রাবেয়া।

কি?

কোথায় কোথায় বেড়াতে যাস তুই?

কত জায়গায়। চেনা বাড়িতে।

খুব ভালো লাগে?

হুঁ।

কাকে কাকে ভালো লাগে?

সবাইকে!

ছেলেদের ভালো লাগে?

হুঁ।

নাম বল তাদের।

একটানা নাম হলে চলে সে। তাদের কাউকেই সন্দেহভাজন মনে হয় না। আমার। সবাই বাচ্চা বাচ্চা ছেলে। রাবেয়াকে বড়ো আপা ডাকে।

তারা তোকে আদর করে, রাবেয়া?

হুঁ।

কী করে আদর করে?

আমার সঙ্গে খেলে, আর—

আর কি?

গল্প করে।

কিসের গল্প?

ভূতের।

ইতস্তত করে বলি, তোকে কেউ চুমু খেয়েছে রাবেয়া?

যাহ! তাই বুঝি খায়?

মার কথাগুলি হয় আরো স্পষ্ট, আরো খোলামেলা। আমার লজ্জা করে। মা আদুরে গলায় বলেন, রাবেয়া, কে তোর শাড়ি খুলেছিল? বল তো নাম।

যাও মা, তুমি তো ভারি...

মা রেগে যান। হপাতে হাঁপাতে বলেন, তাহলে এমন হল কেন? বল তুই হারামজাদী?

রাবেয়া বলে না কিছু, মা ফুঁপিয়ে—ফুঁপিয়ে কাঁদেন। রাবেয়া বড়ো বড়ো চোখে তাকায়। বলে, কাঁদা কেন, মা?

বল, কার সঙ্গে তুই শুয়েছিলি?

রাবেয়া চুপ করে থাকে। কথাই হয়তো বুঝতে পারে না। বাবা পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন। মেজাজ হয়েছে খিটখিটে, অল্পতেই রেগে বাড়ি মাথায় তোলেন। রুনু স্কুল থেকে ফিরতে দেরি করেছে বলে মার খেল সেদিন। এক দিন দেখি বাবা গণক নিয়ে এসেছেন, পাড়ার সব যুবকদের নাম লিখে কী-সব মন্ত্র পড়ছে সে।

রাবেয়ার অসুখের প্রত্যক্ষ চিহ্ন ধরা পড়ল এক দিন ভোরে। চা খেয়েই ওয়াক ওয়াক করে বমি করল সে। যদিও তার শারীরিক অস্বাভাবিকতা নজরে আসার সময় এখনো হয় নি, তবু তার শরীরে আলগা শ্রী আসছিল। একটু চাপা গাল ভরাট হয়ে উঠছে, ভুরু মনে হচ্ছে আরো কালো, চোখ হয়েছে উজ্জ্বল, চলাফেরায় এসেছে এক স্বাভাবিক মন্থরতা। স্কুলের হেড-মাস্টারের বউ এক দিন বেড়াতে এসে বললেন, দেখ ও বউ, তোমার মেয়ে কেমন হাঁটছে–ঠিক যেন পোয়াতি।

কথাগুলি আমার বুকে ধক করে বিধেছে। কিছু একটা করতে হবে এবং খুব শিগগিরই। সবার জানিবার ও বুঝবার আগে। একটি করে দিন যাচ্ছে, অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে

যাচ্ছি। সবাই। কিন্তু কী করা যায়? বাবা নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবেছেন। এক বার ইচ্ছে হয় তাঁকে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। বাবাকে বড়ো ভয় করি আমরা।

সেদিন রাতে শুনলাম। বাবা চাপা কণ্ঠে বলছেন, বিষ খাইয়ে মেরে ফেল মেয়েকে। মা বললেন, ছিছি, বাপ হয়ে এই বললে? বাবা বিড়বিড় করে বললেন, আমার মাথার ঠিক নেই শানু, তুমি কিছু মনে করো না। পাগল মেয়ে আমার! বাবার দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনলাম। অনেক রাত অবধি ঘুম হল না। আমার। একসময় রাবেয়া ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। কাতর গলায় বলল, খোকা।

কি? বাথরুমে যাবি?

উঁহু!

কী হয়েছে? খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ।

বমি করবি?

না।

স্বপ্ন দেখেছিস?

হুঁ।

কী স্বপ্ন?

মনে নেই।

ঘুমিয়ে পড়, ভালো লাগবে।

আচ্ছা।

রাবেয়া শুয়ে পড়ল আবার। মুহূর্তেই উঠে বসে বলল, খোকা।

কি?

পলা এসেছে।

কে এসেছে?

পলা। দোর খুলে দেখ, বারান্দায় বসে আছে। আমি ডাক শুনলাম।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম দু জনেই। কোথায় কি? খা-খাঁ করছে চারদিক। রাবেয়া ডাকল, পলা, পলা।

মা বললেন, কে কথা বলে?

আমি রাবেয়া, মা।

বাবা ধমকে উঠলেন, যাও যাও, ঘুমুতে যাও! কী কর এত রাত্রে?

শব্দ শুনে মাস্টার কাকা বাইরে আসেন।

কী হয়েছে খোকা?

রাবেয়া বলে, পলাকে ডাকছিলাম কাকা।

যাও শুয়ে পড়, পলা কোথেকে আসবে এত রাত্তিরে?

শুতে শুতে রাবেয়া বলল, খোকা, পলাকে একটা চামড়ার বেল্ট কিনে দেবে? গলায় বেধে দেব।

আচ্ছা!

আর একটা লম্বা শিকল কিনে দেবে?

দেব!

আচ্ছা, আর একটা জিনিস দেবে?

কি জিনিস?

নাম মনে নেই আমার। দেবে তো?

আচ্ছা দেব।

কবে? কাল?

না, চাকরি হোক আগে।

বাবা বলে উঠলেন, কি ভ্যাজর ভ্যাজর করছিস তোরা? ঘুমো। সারা দিন খেটে এসে শুই, তাও যদি শান্তি পাওয়া যায়।

৫. চাকরি

বহু আকাঙ্ক্ষিত চিঠিটি এল। সরকারী সীল থাকা সত্ত্বেও কিছুই বুঝতে পারি নি। আর দশটা খাম যেমন খুলি, তেমনি আড়াআড়ি খুলে ফেললাম। আমাকে তাঁরা ডাকছেন। রসায়নশাস্ত্রের লেকচারারশিপ পেয়েছি, একটি কলেজে। প্রাথমিক বেতন সাড়ে চার শ টাকা, ইয়ারলি পাঁচশ টাকা ইনক্রিমেন্ট। লেখাগুলি কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছিল। খুব খুশি হয়েছি। এমন একটা অনুভূতি আসছিল না। অথচ আমি সত্যি খুশি হয়েছি। এবং আমি সবাইকে সুখী করতে চাই। সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যেতে চাই, বুনুকে গাঢ় সবুজ একটি শাড়ি দিতে চাই, রোল নাম্বার থাটিন-এর গায়ে যেমন দেখেছি। এখন হয়তো সমস্তই আমার মুঠোয়, তবু সেই অগাধ সুখ, সমস্ত শরীর জুড়ে উন্মাদ আনন্দ কই? আমরা বহু কষ্ট পেয়ে মানুষ হয়েছি। আমাদের ছেলেমানুষি কোনো সাধ, কোনো বাসনা আমার বাবা-মা মেটাতে পারেন নি। আমাদের বাসনা তাঁদের দুঃখই দিয়েছে। আজ আমি সমস্ত বেদনায় সমস্ত দুঃখে শান্তির প্রলেপ জুড়াব। আলাদীনের প্রদীপ হাতে পেয়েছি, শক্তিমান দৈত্যটা হাতের মুঠোয়।

মা আমার চাকরি হয়েছে।

মা দৌড়ে এলেন। বহুদিন পর তাঁর চোখ আনন্দে ছলছল করে উঠল। বললেন, দেখি। আমি চিঠিটা তার হাতে দিলাম। মা পড়তে জানেন না, তবু উল্টেপাল্টে দেখলেন সেটি। এমনভাবে নাড়াচাড়া করছিলেন, যেন খুব একটা দামী জিনিস হাতে। মা বললেন, বেতন কত রে?

সাড়ে চার শ।

বলিস কি? এত।

আমি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললাম, বেশি আর কোথায়? বলেই আমি লজ্জা পেলাম। ভালো করেই জানি, টাকাটা আমার কাছে অনেক বেশি। মা বললেন, এবার বিয়ে করাব তোকে।

কী যে বলেন।

বেশ একটি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে আনতে হবে। রূপবতী কিন্তু সাধাসিধা, নাহার মেয়েটির মতো।

মা কল্পনায় সুখের সাগরে ডুব দিলেন।

শহরে তুই বাসা করবি?

তা তো করতেই হবে।

বেশ হবে, মাঝে মাঝে তোর কাছে গিয়ে থাকব।

মাঝে মাঝে কেন, সব সময়ে থাকবেন।

না রে বাপু, সংসার ফেলে যাব না।

মা ছেলেমানুষের মতো হাসলেন। আমি বললাম, প্রথম বেতনের টাকায় আপনাকে কী দেব মা?

তোর বাবাকে একটা কোট কিনে দিস, আগেরটা পোকায় নষ্ট করেছে।

বাবারটা তো বাবাকেই দেব, আপনাকে কী?

মা রহস্য করে বললেন, আমায় একটা টুকটুকে বউ এনে দে।

মাস্টার কাকাও খবর শুনে খুশি হলেন। তাঁর খুশি সব সময়ই মৌন। এবার একটু বাড়াবাড়ি ধরনের আনন্দ করলেন। নিজের টাকায় প্রচুর মিষ্টি কিনে আনলেন। অনেক মিষ্টি। যার যত ইচ্ছে খাও। কাকা বললেন, সুখ আসতে শুরু করলে সুখের বান ডেকে যায়, দেখো খোকা, কত সুখ হবে তোমার।

রুনু স্কুল থেকে এসে বলল, দাদা, তোমার নাকি বিয়ে?

কে বলেছে রে?

মা, হি হি।

খুব হি হি, না? তোকে বিয়ে দি যদি?

যাও, খালি ঠাট্টা। কাকে তুমি বিয়ে করবে দাদা?

দেখি ভেবে!

আমি জানি কার কথা ভাবছি।

কার কথা?

শীলার কথা নয়?

পাগল তুই!

অবহেলায় উড়িয়ে দিলেও বুঝতে পারছি, আমার কান লাল হয়ে উঠছে। অস্বস্তি বোধ করছি। শীলুকে কেন যে হঠাৎ ভালো লাগল। যত বার তাকে দেখি, তত বার বুক ধ্বক করে ওঠে। একটা আশ্চর্য সুখের মতো ব্যথা অনুভব করি। সমস্ত শরীর জুড়ে শীলুশীলু করে কারা বুঝি চেঁচায়। আমি একটু হেসে বলি, কে ভাবে তোর শীলুর কথা?

না, এমনি বলছি মা। বড়ো ভালো মেয়ে শীলু।

হুঁ। তুই কাকে বিয়ে করবি রুনু?

যাও দাদা, ভালো হবে না বলছি।

আমার এক জন বন্ধু আছে, খুব ভালো ছেলে–

দাদা, আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব এবার।

আনন্দ-অনুষ্ঠান থেকে মন্টু বাদ পড়ল। বড়ো নানার বাড়িতে গিয়েছে সে, আগামী কাল আসবে। বাবা এলেন রাত নটার দিকে। মা খবরটা না দিয়ে মিষ্টি খেতে দিলেন বাবাকে।

মিষ্টি কিসের?

আছে একটা ব্যাপার।

বাবা আধখানা মিষ্টি খেলেন, ব্যাপার জানার জন্যে উৎসাহ দেখালেন না। মা নিজের থেকেই বললেন, খোকার চাকরি হয়েছে। সাড়ে চার শ টাকা মাইনে।

বাবা খুশি হলেন। থেমে থেমে বললেন, ভালো হয়েছে। আমি চাকরি ছেড়ে দেব এবার। বয়স হয়েছে, আর পারি না। রাবেয়া, রাবেয়া কোথায়?

ঘুমিয়েছে, শরীর খারাপ।

ভাত খায় নি তো?

না, একটা মিষ্টি খেয়েছে শুধু।

আহ্! বললাম খালিপেটে রাখতে, মিষ্টিই—বা দিলে কেন?

সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লাম সেদিন। রাত একটার দিকে মা পাগলের মতো ডাকলেন, খোকা, ও খোকা।–শিগগির ওঠ। ও খোকা, খোকা।

খুব ছোটবেলায় গভীর রাতে একবার মা এমন ব্যাকুল হয়ে ডেকেছিলেন। ভূমিকম্প হচ্ছিল তখন। আমাদের বাসা থেকে চল্লিশ গজের ভিতর নদী সাহেবদের ছেড়ে-যাওয়া পুরানো বাড়ি ধ্বসে পড়ে গিয়েছিল। আজকের এই গভীর রাতে মায়ের আতঙ্কিত ডাক আমাকে ভূমিকম্পের কথা মনে করিয়ে দিল। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই মা বললেন, আয় আমার ঘরে, আয় তাড়াতাড়ি।

কী হয়েছে?

মা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন। দরজা খোলা, চোখে পড়ল মায়ের বিছানায় রাবেয়া শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে বাবা গরুর মতো চোখে তাকিয়ে আছেন। রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। এ্যাবোরশান নাকি? কাকে দিয়ে কি করালেন? নাকি নিজে নিজেই কিছু খাইয়ে দিয়েছেন? বাবা ধরা-গলায় বললেন, খোকা, তুই মাথায় একটু হাওয়া কর, আমি এক জন বড়ো ডাক্তার নিয়ে আসি। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।

ডাক্তার এলেন এক জন। গম্ভীর হয়ে ইনজেকশন করলেন।

আপনার মেয়েকে আমি চিনি।

বাবা ডাক্তারের হাত চেপে ধরলেন, বড়ো দুঃখী মেয়ে, মেয়েটাকে আপনি বাঁচান ডাক্তার।

ডাক্তার সেন্টিমেন্টের ধার দিয়েও গেলেন না। এক গাদা ঔষধ দিয়ে গেলেন। সকালে আরো দুটো ইনজেকশন করতে বললেন। দশটার দিকে তিনি আসবেন।

বাবা হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, কেউ জানবে না তো ডাক্তার?

ডাক্তার বললেন, মান ইজ্জত পরের ব্যাপার, আগে মেয়ে বাঁচুক।

রাবেয়া চি চি করে বলল, মা, আমার কী হয়েছে?

কিছু হয় নি, সেরে যাবে, চুপ করে শুয়ে থাক।

বুকটা খালিখালি লাগছে কেন?

সেরে যাবে মা, দুধ খাবে একটু?

না।

আমি আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঘরে লম্বালম্বি একটা ছায়া পড়ল। তাকিয়ে দেখি মাস্টার কাকা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। একটু কাশলেন তিনি। বাবা হাউমাউ করে কেঁদে বললেন, শরীফ মিয়া, আমার মেয়েটাকে বাঁচাও।

মাস্টার কাকা মৃদু গলায় বললেন, শহর থেকে খুব বড়ো ডাক্তার আনব আমি। খোকা, তোর সাইকেলটা বের করে দে।

আমি বললাম, আমি যাই কাক?

না, তুমি গুছিয়ে বলতে পারবে না। তুমি থাক।

বাবা ধমকে উঠলেন, ওর কথা শুন না। ও একটা পাগল-ছাগল। তুমি যাও। নিজেই যাও।

রুণু কখন-বা এসেছে। আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। ঘরময় নষ্ট রক্তের একটা দম আটকান অস্বস্তিকর গন্ধ। রাবেয়া চোখ বুজে শুয়ে। তার মুখটা কী ফর্সাই না দেখাচ্ছে। বাবা বললেন, মা রাবু, একটু দুধ খাও।

না।

মাথায় পানি দেব মা?

না বাবা।

রাবেয়া চোখ মেলে বাবার দিকে তাকাল। বলল, বাবা।

কি মা?

আমার বুকটা খালিখালি লাগছে কেন?

সেরে যাবে মা।

তুমি আমার বুকে হাত রাখবে একটু? এইখানে?

এমনি করেই ভোর হল। মন্টু এল ছটায়।

সে হাতভম্ব হয়ে গেল। বাবা গিয়েছেন ইনজেকশন দেবার লোক আনতে। রাবেয়া মন্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, মন্টু আমার অসুখ করেছে।

মন্টু বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল। রাবেয়া আবার বলল, মন্টু, আমার বুকটা খালিখালি লাগছে।

মন্টু রাবেয়ার মাথায় হাত রাখল। মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। রুনু আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। সকালের রোদ এসে পড়েছে জমাট-বাঁধা কালো রক্তে। রাবেয়া আমাকে ডাকল, খোকা, ও খোকা।

আমি তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছি। নীল রঙের চাদরে ঢাকা রাবেয়ার শরীর নিষ্পন্দ পড়ে আছে। একটা মাছি রাবেয়ার নাকের কাছে ভনভন্ন করছে। রাবেয়া হঠাৎ করেই বলে উঠল, পলাকে তো দেখছি না। ও খোকা, পলা কোথায় রে? আমাদের চারদিকে উদ্বিগ্ন হয়ে পলাকে খুঁজলে সে। আর কী আশ্চর্য, বেলা নটায় চুপচাপ মরে গেল রাবেয়া। তখন চারদিকে শীতের ভোরের কী ঝকঝকে আলো!

গত বৎসর আমরা বড়ো খালার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। বড়ো খালার মেয়ে নিনাও এসেছিল মায়ের কাছে। প্রথম পোয়াতি মেয়ে। মা নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে। নিনা

আপা কি প্রসন্ন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চারদিকে। প্রথম সন্তান জন্মাবে, তার কী প্রগাঢ় আনন্দ চোখে-মুখে। যদি ছেলে হয়, তবে তার নাম দেব কিংশুক, মেয়ে হলে রাখী। হেসে-হেসে বলে উঠেছিলেন নিনা আপা। আর তাতেই উৎসাহিত হয়ে রাবেয়া বলেছিল, আমিও আমার ছেলের নাম কিংশুক রাখব। আমরা সবাই হেসে উঠেছিলাম। রাবেয়া, নীল রঙের চাদর গায়ে জড়িয়ে তুই শুয়ে আছিস। হলুদ রোদ এসে পড়ছে তোর মুখে। কিংশুক নামের সেই ছেলেটি তোর বুকের সঙ্গে মিছে গেছে। যে—বুক একটু আগেই খালিখালি লাগছিল।

বারোটার দিকে ফিরে এলেন মাস্টার কাকা। সঙ্গে শহর থেকে আনা বড়ো ডাক্তার। আর মন্টু, দিনে-দুপুরে অনেক লোকজনের মধ্যে ফালা-ফালা করে ফেলল মাস্টার কাকাকে একটা মাছ-কাটা বঁটি দিয়ে। পানের দোকান থেকে দৌড়ে এল দু-তিন জন। এক জন রিকশাওয়ালা রিকশা ফেলে ছুটে এল। ওভারশীয়ার কাকুর বড়ো ছেলে জসীম দৌড়ে এল। ডাক্তার সাহেব চেঁচাতে লাগলেন, হেল্প! হেল্প! চিৎকার শুনে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আমি দেখলাম, বঁটি হাতে মন্টু দাঁড়িয়ে আছে। পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরে আছে কজন মিলে। রক্তের একটা মোটা ধারা গড়িয়ে চলেছে নালায়। মন্টু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদা, ওকে আমি মেরে ফেলেছি।

আমার মনে পড়ল, হাস্নুহেনা গাছের নিচে মন্টু এক দিন পিটিয়ে একটা মস্ত সাপ মেরেছিল।

রাবেয়াকে ঘিরে সবাই বসে ছিল। আমি ঢুকতেই নাহার ভাবী বললেন, বাইরে এত গোলমাল কিসের?

আমি মায়ের দিকে তাকালাম, মা, এইমাত্র মন্টু মাস্টার কাকাকে খুন করেছে। আপনি বাইরে আসেন। মন্টুকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে সবাই।

হাস্নুহেনা গাছের নিচে মন্টু একটা মস্ত চন্দ্রবোড়া সাপ মেরেছিল। সাপের মাথায় গোল বেগুনি রঙের চক্র। চার হাতের উপর লম্বা। মন্টু, মরা সাপটাকে কাঠির আগায় নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াতেই ছোট বাচ্চারা উল্লাসে লাফাতে লাগল। রাবেয়া খুশিতে হেসে ফেলে বলল, মন্টু, কাঠিটা আমার হাতে দে।

পলা আনন্দে ঘেউঘেউ করছিল। মাঝে মাঝে লাফিয়ে সাপটাকে কামড়াতে গিয়ে ফিরে আসছিল। রাবেয়া পলার দিকে তাকিয়ে শাসাল, এই পলা এই, মারব থাপ্পড়।

সাপটাকে সবাই মিলে পুকুরপাড়ে কবর দিতে নিয়ে গেল। মিছিলের পুরোভাগে রাবেয়া। তার হাতের কাঠিতে সাপটা আড়াআড়ি ঝুলছে। মন্টু পলাকে নিয়ে দলের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। সাপের জন্য লম্বা করে কবর খোঁড়া হল। মন্টু পুকুরপাড়ে বিষণ্ণভাবে বসেছিল।

কাকাকে মেরে ফেলবার পর মন্টুকে সবাই জাপটে ধরে রেখেছিল। জসী মন্টুর হাত শক্ত করে ধরে চেঁচাচ্ছিল, পুলিশে খবর দিন। পুলিশে খবর দিন। মাছকাটার বঁটিটা কাৎ হয়ে ঘাসের উপর পড়ে আছে। সেখানে একটুও রক্তের দাগ নেই। কাকা যেখানে পড়ে ছিলেন, সেখান থেকে একটা মোটা রক্তের ধারা ধীরে ধীরে নালার দিকে নেমে যাচ্ছিল। মন্টু আমায় দেখে বলল, দাদা, ওকে আমি মেরে ফেলেছি।

মন্টু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। আশেপাশে প্রচুর লোক জমা হয়ে গিজগিজ করছিল। মোটা ডাক্তার ভাঙা গলায় প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিলেন, হেল্প! হেল্প! একটা পাংশুটে রঙের কুকুর মরা লাশটার কাছে ভিড়বার চেষ্টা করছিল।

মন্টুর কুকুরের রং ছিল সাদা। গলার কাছে কালো একটা ফুটকি। মন্টু কাঞ্চনপুর থেকে এনেছিল কুকুরটাকে। অল্প দিনেই ভীষণ পোষ মেনেছিল। মন্টু তাকে টুলকাি‌ঠ দিয়ে একটি চমৎকার ঘর বানিয়ে দিয়েছিল। আমি কুকুরটার নাম দিয়েছিলাম পলা। রাবেয়া মন্টুর কাছ থেকে আট আনা দিয়ে কিনে নিয়েছিল। মন্টুর বিক্রির ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু রাবেয়া পীড়াপীড়ি করছিল, মন্টু পলাকে আমি কিনব।

না। আপা, আমি পলাকে বেচব না।

আহা, দে না মন্টু। আট আনা পয়সা দেব আমি। দে না।

বললাম তো আমি বেচব না।

মন্টু দিয়ে দে, এমন করছিস কেন?

রাবেয়া সব সময় পলাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতি। পরিচিত। ঘরবাড়িতে গিয়ে বলত, খালাম্মা আমার পলাকে একটু দুধ দিন। আহা, চিনি দিয়ে দিন। শুধু শুধু দুধ বুঝি কেউ খায়?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

মন্টু এক দিন একটা টিয়। পাখির বাচ্চা আনল কোথা থেকে। সেটি বাচ্চা হলেও খুব চমৎকার ছিল দেখতে। বারান্দায খাঁচা ঝুলিয়ে পাখিটিকে রাখা হত। ঠাণ্ডা লেগে এক দিন সেটি মারা গেল। মন্টু পাখির শোকে এক বেলা ভাত খেল না।

মন্টু আর মাস্টার কাকা সবচেয়ে ছোট ঘরটায় থাকতেন। ঘরটায় আলো আসত না ভালো। গরমের সময় গুমোট গরম। বাতাস আসার পথ নেই। মন্টুর হাজতবাসের দিনগুলি এখন কেমন কাটছে? মন্টু বয়স এখন উনিশ, সাত বাদ দিলে হয় বারো। বারো বৎসর সে আর মাস্টার কাকা একসঙ্গে একটি ঘরে কাটিয়েছে। মাস্টার কাকার অভাব সে অনুভব করছে কি? খুনের পর শুনেছি। অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায়। দিনরাত্তির খুন করা লোকের চেহারা, খুনের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে থাকে। মন্টুর সে-রকম হবে না। তার বড়ো শক্ত নার্ভ। মন্টুর মা, আমাদের বড়োমা যেদিন মারা গেলেন, মন্টু সেদিন নিতান্ত সহজভাবেই কাটাল। পরদিন শিমুলতলা গাঁয়ে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গেল বাসায় কাউকে না বলে। বয়স অল্প ছিল। শোক বোঝবার বুদ্ধিই হয়তো হয় নি। কিন্তু আমার মনে হয় কম বয়সের জন্যে নয়। বড়োমার মতো তারও ইস্পাতের মতো শক্ত নার্ভ ছিল। মন্টু দেখতে অনেকটা বড়োমার মতো। তার চাইবার ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি, সমস্তই বড়োমায়ের মতো। বাবার শোবার ঘরে বড়োমা আর বাবার একটা যৌথ ছবি আছে। বিয়ের ছবি। সেই ছবির দিকে তাকালেই মন্টুকে চেনা যায়। ছবির কাচে ময়লা জমে ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু বড়োমার বালিকা বয়সের ছবি আমাদের আকর্ষণ করে। চৌঠা আগষ্ট আমাদের বাসায় একটা উৎসব হয়। ভুল বললাম, শোকের আসর হয়। বাদ-মাগরেব মিলাদ পড়ান হয়। বাবা বড়োমায়ের কবর জিয়ারত করেন। দু-একটি ফকিরমিসকিনকে খাওয়ান হয়। হাউমাউ করে বাবা বড়োমায়ের মৃত্যুদিন স্মরণ করে কিছুক্ষণ কাঁদেন। তাঁর শোকটা নিশ্চয়ই আন্তরিক, তবু সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন হাস্যকর লাগে। বিশেষ করে এই দিনটিতে

মা মুখ কালো করে ভয়ে-ভয়ে ঘুরে বেড়ান। তাঁর ভাব দেখে মনে হয় চৌঠা আগষ্টের এই শোকের দিনটির জন্যে মা নিজেই দায়ী। বাবা সেদিন অতি সামান্যতম অতি তুচ্ছতম ব্যাপারেও মায়ের উপর ক্ষেপে যান। আমার কষ্ট হয়। বড়োমা আমাদের সবারই অতি শ্রদ্ধার মানুষ। রাবেয়া আর আমি অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে জড়িয়ে না ধরে ঘুমুতে পারি নি। যখন বয়স হয়েছে, তাঁর কোলে এসেছে মন্টু। আমি আর রাবেয়া দক্ষিণের ঘরে নির্বাসিত হয়েছি, তখনো তিনি মাঝে মাঝে এসে বলতেন, খোকা আজ তুই শুবি আমার সাথে। আগে আমার সঙ্গে ঘুমাবার জন্যে এত হৈচৈ করতিস, এখন যে বড়ো চুপচাপ?

বড়ো হয়েছি যে।

ওহ, কী মস্ত বড়ো ছেলে।

বড়োমার গলা জড়িয়ে তার বিরফি-কাটা ছাপের ব্লাউজে নাক ডুবিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় আবদার, গল্প বলেন বড়োমা। ভূতের গল্প।

বড়োমা কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে গল্প বলতেন, আমরা তখন ছোট। বারোতের বৎসরের বেশি বড়ো নয়। নানার বাড়ি যাচ্ছি। সবাই। ভাদ্র মাস, নদী কানায় কানায় ভরা। সারা দিন নৌক চলল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাঝিরা পুরান এক তালগাছের সঙ্গে নৌকা বেঁধে রান্না বসিয়েছে। এমন সময় রুস্তম বলে যে—বুড়ো মাঝিটা ছিল, তার সে কি বিকট চিৎকার, কর্তা তালগাছে এটা কী? আমি শুনেই বাবাকে জাপ্টে ধরেছি। তালগাছের দিকে চাইবার সাহস নেই। বলতে বলতে বড়োমা থামতেন, আমরা ফুসে উঠতাম, থামলে কেন, বল শিগগির।

গল্প শুনে আতঙ্কে জমে যেতাম। কী অদ্ভুত তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি! বড়োমার মৃত্যুর দিনটিতে বাবার হৈচৈ আমার তাই ভালো লাগত না। আমার মনে হত আড়ম্বরের চেয়ে মৌন দুঃখানুভূতিই হয়তো ভালো হত। আমি মনে মনে বললাম, বড়োমা তোমার ছেলের আজ বড়ো বিপদ।

হ্যাঁ, আজ মন্টুর বড়ো বিপদ। বড়ো ভয়ঙ্কর বিপদ। মন্টু কি বড়ো মাকে ডাকছে? ফুটবলের খুব নেশা ছিল মন্টুর। খেলতে গিয়ে পা ভেঙে ছেলেদের কাঁধে চড়ে বাসায় এল। হাঁটুর নিচে আধ-হাতখানেক জায়গা কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। হৈচৈ শুনে বড়োমা বেরিয়ে আসতেই মন্টু বলল, মা, আমি পা ভেঙে ফেলেছি।

বড়োমা বললেন, সেরে যাবে।

মন্টুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। এক্সরে করে দেখা গেল ভেতরে হাড়ের একটা ছোট ছুঁচাল কণা ভেঙে রয়ে গেছে, কেটে বের করতে হবে।

মন্টুকে সাদা বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। এনেসথেসিয়া করার বড়ো চৌকো। ধরনের যন্ত্রটা ডাওগার মন্টুর মুখের কাছে নামিয়ে আনলেন। ছোট্ট মন্টু আতঙ্কে নীল হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন, বল খোকা বল, এক দুই তিন চর। মন্টু বলল, মা, মা, মা।

আজ মন্টুর বড়ো বিপদ। দুর্গন্ধ কম্বলে মাথা চাপা দিয়ে আজো কি সে মা মা জপছে? না, মন্টু বড়ো শক্ত ছেলে। ইস্পাতের মতো তার নার্ভ। দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আকন্দকে খুন করেছ?

জ্বি।

কী দিয়ে?

বঁটি দিয়ে, মাছ কাটা বঁটি।

কটা কোপ দিয়েছিলে?

মনে নেই।

মরবার সময়ে তিনি কিছু বলেছিলেন?

জ্বি।

কী বলেছিলেন?

বাবা মন্টু।

আর কিছু বলেন নি?

না।

তিনি কি তোমাদের খুব শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন?

জ্বি, ছিলেন।

তুমি কী করা?

বি. এ. পড়ছিলাম।

দারোগা সাহেব কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। এবার শুরু করলেন আপনি করে।

কী জন্যে খুন করেছেন তাঁকে?

মন্টু চুপ করে রইল। দারোগা সাহেব বললেন, আমাকে বলতে কোনো অসুবিধা নেই। কোর্টে অন্য কথা বললেই হল। বাঁচার অধিকার তো সবারই আছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক কোনো স্ক্যাণ্ডাল–

ছিঃ!

আমার মনে হয় আপনি মিথ্যা বলছেন।

আমি মিথ্যা বলি না।

মন্টু খুব স্পর্ধার সঙ্গে বলল, আমি মিথ্যা বলি না। বলতে গিয়ে বুক টান করে দাঁড়াল।

দারোগা সাহেবের মাথা উপর একটা ফ্যান ঘুরছিল। ফ্যানের বাতাসে মন্টুর চুল কাপিছিল। আমি কাঁচুমাচু হয়ে ভদ্রলোকের সামনে একটা চেয়ারে বসেছিলাম। মন্টু কি কখনো মিথ্যা বলে না? মন্টুর সঙ্গে কথাবার্তা তেমন হয় না। সে জন্ম থেকেই নীরব। তাকে বোঝা হয়ে ওঠে নি। আমার। রুনু সম্বন্ধে আমি যেমন বলতে পারি, রুনুর একটু মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে। যখন সে মিথ্যা বলে, তখন সে মাথা নিচু করে অল্প অল্প হাসে। মন্টু সম্বন্ধে এমন কিছু বলতে পারছি না। আমি।

আপনি কি খুব ভেবেচিন্তে খুন করেছেন?

না, খুব ভাবি নি।

আমার মনে হয়, আপনি খুব অনুতপ্ত?

না।

তাঁকে খুন করার ইচ্ছে কি হঠাৎ আপনার মনে জেগেছে, না। আগে থেকেই ছিল?

হঠাৎ জেগেছে।

তিনি কোন ধরনের লোক ছিলেন?

ভালো লোক। বিদ্বান, অনেক জানতেন।

আপনাদের সঙ্গে তাঁর কী ধরনের সম্পর্ক ছিল?

ভালো। আমাদের খুব স্নেহ করতেন।

তাঁকে খুন করা কি খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল?

জানি না। আমার রাগ খুব বেশি।

হ্যাঁ, মন্টুর রাগ বেশি। ভয়ঙ্কর উন্মাদ রাগ। আমি জানি, এ সম্বন্ধে ভালো করেই জানি। দু বৎসর হয় নি এখনো। অনার্স পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসেছি, সময়ও মনে আছে, পৌষ মাস। দারুণ শীত। আমাদের সামনের বাসায় থাকতেন এক ওভারশীয়ার সাহেব। তাঁর মেয়ে এবং ছেলে সব মিলিয়েই এক জন, মীনা। বয়স আমার সমান কিংবা আমার চেয়ে দু-এক বৎসরের বড়ো। ওভারশীয়ার ভদ্রলোকের ভারি আদরের মেয়ে, সব সময় চোখে–চোখে রাখতেন। মেয়েটি বেশির ভাগ সময়ই কাটাত বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে। ওভারশীয়ার ভদ্রলোক এক দিন হাতে একটি চিঠি নিয়ে চড়াও হলেন আমাদের বাসায়। আমি বাইরেই বসে ছিলাম, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই চিঠি তুমি লিখেছ?

নামহীন একটি চিঠি তিনি আমার সামনে ফেলে দিলেন।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম, কি বলছেন আপনি!

নিশ্চয়ই তুমি, এত বড়ো সাহস তোমার, এমন নোংরা কথা আমার মেয়েকে লিখেছি।

ভদ্রলোক গজাতে লাগলেন। আমি হতভম্ব এবং লজ্জিত। এমনিতেই আমি একটু লাজুক ধরনের ছেলে। এ ধরনের অভিযোগে একেবারে বোকা বনে গেলাম।

তুমি কি মনে করেছ, আমি ছেড়ে দেব? এ্যাঁ? ভদ্রলোকের মেয়েছেলের মান-ইজ্জত!

কথা শেষ হবার আগেই মন্টু ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শান্ত গলায় বলল, যান। আপনি বাড়ি যান।

বললেই হল, যা ইচ্ছে তা লিখে বেড়াবে, আর আমি বসে বসে কলা চুষব?

মন্টু নিমিষের মধ্যে, আমার কিছু বোঝবার আগেই, ভদ্রলোকের কলার চেপে ধরল। হুঁঙ্কার দিয়ে বলল, চোপরাও ছোটলোক। মা বেরিয়ে এলেন। আশেপাশে লোক জমে গেল। আমি তটস্থ। মন্টু চেঁচাতে লাগল, দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে তোমার মেয়ের কারবার, আর তুমি এসেছ দাদার কাছে?

ওভারশীয়ার ভদ্রলোক বদলি হয়ে গেছেন রাজশাহী। মেয়েকে নিশ্চয়ই কোথাও বিয়ে দিয়েছেন। তিনি এখানে থাকলে মন্টুর উন্মাদ রাগের পরিণতি দেখে খুশি হতেন হয়তো।

মাস্টার কাকার বাড়ি থেকে লোক এল এক জন। দড়ি-পাকান চেহারা। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, ছুঁচাল দাড়ি। চোখে নিকেলের চশমা।

শরীফ আকন্দের ভাই আমি। বড়ো ভাই। তার জিনিসপত্র, টাকা-পয়সা যা আছে নিতে। এসেছি।

আমি বললাম, জিনিসপত্র বিশেষ নেই, তবে অনেক বই আছে।

টাকা পয়সা কী আন্দাজ আছে?

দু শ পনের টাকা ছিল।

মাত্র! তবে যে শুনলাম বহু টাকা। টাকার জন্যেই খুন করা হয়েছে।

লোকটি কুৎকুতে চোখে তাকাচ্ছিল। পান-চিবান ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে-পড়া লালা টেনে নিচ্ছিল মাঝে মাঝে। গলা খাকারি দিয়ে সে বলল, আপনারা যা বলবেন। এখন তো তাই সত্যি। তা সে টাকা কটাই দিন। আসতেই আমার পঁচিশ টাকা খরচ।

তাঁর সব কিছুই থানায়। আপনি সেখানেই যান।

কই?

থানায়।

অ।

ভদ্রলোক বিমর্ষ হয়ে চলে গেলেন। রুনু বলল, দাদা, ও কি সত্যি মাস্টার কাকার ভাই?

হুঁ।

কী করে বুলে?

এক রকম চেহারা।

মাস্টার কাকার চেহারা আমার মনে আছে। গত পরশু শেষ রাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি। বড়োমাকেও দেখেছি। বড়োমা অবাক হয়ে বলছেন, তুই এই হলুদ রঙের শাড়ি আনলি আমার জন্যে, খোকা? এই শাড়ি পরার বয়স কি আছে রে বোকা?

বেতন পেয়ে সবার জন্যেই কিছু-না-কিছু কিনেছি। আপনি নেন এটা।

সবার জন্যেই কিনেছিস?

জ্বি।

কী কী কিনলি?

আমি নাম বলে চললাম। বড়োমা আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, সবার স্ট্রনৌ ২ কিিনলি, মাস্টারের জন্য কিনলি না? সে বাদ পড়ল বুঝি?

আমি অবাক হয়ে বললাম, জানেন না, মাস্টার কাকা তো মারা গেছেন?

আহা, কী করে মারা গেল? বড়ো ভালো লোক ছিল।

www.bengaliebook.com

বড়োমা মাস্টার কাকাকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন; প্রায়ই আলাপ করতেন তাঁর সাথে। মাস্টার কাকা বড়োমাকে বড়োবোনের মতো দেখতেন। আমার মাকে ভাবী বলে ডাকলেও বড়োমাকে ডাকতেন বড়োবুবু বলে। বড়োমা প্রায়ই বলতেন, ও মাস্টার, আমার ভাগ্যটা গুণে দিলে না?

বড়ো বুবু, আপনাদের সবার ভাগ্যই আমি গুণে রেখেছি।

ছাই গুণেছ। বল আমার ভাগ্য।

আপনার জন্মলগ্নে আছে মঙ্গল আর রবির প্রভাব। সৌভাগ্যবতী আপনি। ভাগ্যবান ছেলে হবে আপনার।

বড়োমা হো হো করে হেসে উঠতেন।

মাথার ঠিক নাই তোমার। এই তোমার ভাগ্য গণনা? এই সব বুঝি লেখা বইএ? পুড়িয়ে ফেল তোমার বই। না হয় আমাকে দিও, আমি আগুন করে তোমাকে চা বানিয়ে দেব।

কাকা বিমর্ষ হয়ে বই-এর পাতা ওল্টাতেন। এইখানেই তাঁর গণনা মিলত না। বাবা বড়োমার ছেলে হওয়ার কোনো আশা না দেখেই দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছিলেন।

আশ্চর্যভাবে কাকার গণনা মিলে গেল এক সময়। রুনুর জন্মের পাঁচ বৎসর আগেই বড়োমার কোলে এল মন্টু। বড় মা ভীষণ অবাক হয়েছিলেন কাকার নির্ভুল গণনা দেখে।

কাকাকে ডেকে বললেন, আমার ছেলের ভাগ্যটা একটু দেখি মাস্টার। আশ্চর্য, এসব শিখলে কী করে? আমার শিখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মাস্টার কাকা হেসে বলেছিলেন, এও এক ধরনের বিজ্ঞান বুবু। অন্ধকার বিজ্ঞান। আপনি যদি শিখতে চান...

বড়োমা অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিলেন, আগে আমার ছেলের ভাগ্য বল। তারপর তোমার অন্ধকার বিজ্ঞান।

কাকা বললেন, জন্ম হয়েছে। মঘা নক্ষত্রযুক্ত সিংহ রাশিতে চন্দ্রের অবস্থানকালে। জন্মসময় আকাশে কুন্তলীন। জাতক শনির ক্ষেত্রে রবির হোরায় বুধের দ্রেক্কাণে শুক্রের সপ্তমাংশে...

আহা, কি আরোলতাবোল শুরু করলে, ফলাফলটা বল।

ছেলে বুদ্ধিমান,সাহসী, শক্তিমান আর প্রেমিক। সৌভাগ্যবান ছেলে আপনার। তাকে একটা গোমেন্দ পাথর দেবেন। বুকু, খুব কাজে লাগবে।

বড়োমা মন্টুকে এগারো বৎসরের রেখে মারা গেলেন। মন্টুর জন্যে গোমেদ পাথর আর নেওয়া হল না! সেই পাথর যদি থাকত, আরু বে কি এই বিপদ এড়াতে পারত মন্টু?

আদালতে কৌতূহলী মানুষের ভিড়। জজসাহেব মনে হল বিশেষ কিছু শুনছেন না। সিগারেটের ধোঁয়া, ঘামের গন্ধ, লোকজনের মৃদু কথাবার্তা–সব মিলিয়ে অন্যরকম পরিবেশ গুমোট গরম, যদিও মাথার উপর দুটি নড়বড়ে রং ওঠা। ফ্যান কা-ক্যা শব্দ করে ঘুরছে।

কালো গাউন পরা উকিলরা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। মন্টু সরাসরি তাকিয়ে আছে সামনে। বাবা, আমি আর রুনু বসে আছি জড়সড় হয়ে। মন্টুকে দেখলাম মুখে হাত চাপা দিয়ে কয়েক বার কাশল।

আপনি বলছেন খুন করার ইচ্ছে হঠাৎ হয় নি, কিছুদিন থেকেই মনে ছিল?

হ্যাঁ।

কত দিন থেকে?

কত দিন থেকে আমার মনে নেই।

কিন্তু কী কারণে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার ইচ্ছে হল?

কারণ আমার মনে নেই!

আপনি অসুস্থ?

না, আমি সুস্থ।

ক্রস-একজামিনেশনের শুরুতেই বাবা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ তিনি শব্দ করে কেঁদে ফেললেন। সবাই তাকাল তাঁর দিকে। আদালতে মৃদু গুঞ্জন সরব হয়ে উঠল। জজ সাহেব বললেন, অর্ডার অর্ডার। তার কিছুক্ষণ পরই আদালত সেদিনের মতো মুলতবি হয়ে গেল। মা কাঁপা গলায় বললেন, বিচার শেষ হবে কবে খোকা?

চারদিকে বড়ো বেশি নির্জনতা। বড়ো বেশি নীরবতা। মন্টুর ঘরে বাবা একটা তালা লাগিয়েছেন। রুনুর বিছানায় রুনু এক-একা অনেক রাত অবধি জেগে থাকে। বাতি জ্বালান থাকলে আগে ঘুমুতে পারত না সে। এখন সারা রাত বাতি জ্বলে। হ্যাঁরিকেনের আবছা আলোয় সমস্তই কেমন ভূতুড়ে দেখায়। ঘরের দেয়ালে আমার মাথার একটা প্রকাণ্ড কালো ছায়া পড়ে। মাঝে মাঝে বাবা গোঙানির মতো শব্দ করে কাঁদেন। রুনু আঁৎকে উঠে বলে, কী হয়েছে দাদা? আমি চুপ করে থাকি।

রুনু আবার বলে, দাদা, কী হয়েছে?

বাবা কাঁদছেন।

বাবা গোঙানির মতো শব্দ করে কাঁদেন। বারান্দায় কী অপরূপ জ্যোৎস্না হয়! হানুহেনার সুবাস ভেসে আসে। কুনু বলে, মরার পর কী হয় দাদা?

আমি উত্তর দিই না। মনে মনে বলি, কিছুই হয় না। সব শেষ। যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের-মানুষের হয়না কো দেখা-। অসংলগ্ন কত কথাই মনে ৩ াটেন!

দাদা, মন্টু ভাইয়ের কী হবে?

জানি না।

ঘরের দেয়ালের লম্বা ছায়াগুলির দিকে তাকিয়ে আমার বুক হুঁহু করে। নাহার ভাবী মৃদু ভলুমে গান শোনেন, বিধি ডাগর আখি যদি দিয়েছিল, সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না। কান পেতে শুনি।

মাঝে মাঝে নাহার ভাবী আসেন আমার ঘরে। বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকেন। সেদিনও এসেছিলেন। আমি জানালা বন্ধ করে বসেছিলাম। বাইরে কী তুমুল বৃষ্টি! বিকেলের আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে আগেভাগে। নাহার ভাবী রুনুর বিছানায় এসে বসলেন।

আমি পরশু চলে যাচ্ছি।

আমি চমকে বললাম, কোথায়?

প্রথমে বাবার কাছে যাব। সেখান থেকে বাইরেও যেতে পারি দাদার সঙ্গে, ও চিঠি লিখেছে। যেতে।

আমি চুপ করে রইলাম। নাহার ভাবী বললেন, আপনাদের কথা খুব মনে থাকবে আমার। আপনাদের সবাইকে আমার বড়ো ভালো লেগেছে। রাবেয়ার কথা খুব মনে হয় আমার।

নাহার ভাবী চোখ মুছলেন। রুনুচা নিয়ে এল দু কাপ। নাহার ভাবী চায়ে চুমুক দিয়ে ধরা-গলায় হঠাৎ করেই বললেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, মন্টু এমন কাজ কেন করল বলবেন? অনেকে অনেক কথা বলে। আমার খারাপ লাগে শুনে। আপনাদের আমি বড্ড ভালোবাসি।

মুম্বালাম, রাবেয়ার মৃত্যুর কারণটা তো আপনি জানেন ভাবী।

জানি।

কাকাই হয়তো দায়ী ছিলেন, মন্টু জেনেছিল। অবশ্যি মন্টু বলে নি কিছুই।

মন্টুর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, আমি সব সময় তার জন্যে দোওয়া করব। তাকে আমি ভালো করে দেখিও নি কোনো দিন।

ভাবী, মন্টু বড়ো চুপচাপ ছেলে।

আমার দোওয়ায় কিছু হবে না। তবু আমি তার জন্যে দোওয়া করব।

নাহার ভাবী মাথা নিচু করে বসে ছিলেন! আমার মনে হল, নাহার ভাবী আমাদের বড়ো আপন! বড়ো পরিচিত।

রাবেয়ার একটা ছবি দেবেন আমাকে?

ছবি?

জ্বি। আমি সঙ্গে নিয়ে যেতাম। ও খুশি হত দেখলে। রাবেয়াকে তার খুব ভালো লেগেছিল।

ওর তো কোনো ছবি নেই। আমাদের সবার শুধু একটা গ্রুপ ছবি আছে, মন্টুর জন্মের পর তোলা।

অ।

নাহার ভাবী চলে গেলেন। ট্রাঙ্ক খুলে ছবি বের করলাম আমি। পুরনো ছবি। হলুদ হয়ে গেছে। তবু কী জীবন্তই না মনে হচ্ছে! বাবেয়া হাসিমুখে বসে আছে মেঝেতে। রুনু বাবার কোলে। মন্টু চোখ বুজে বড়োমার কোলে শুয়ে। বুকে গভীর বেদনা অনুভব করছি। স্মৃতি- সে সুখেরই হোক, বেদনারই হোক–সব সময়ই করুণ।

সারা রাত ধরে বৃষ্টি হল। আষাঢ়ের আগমনী বৃষ্টি। বৃষ্টিতে সব যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। রুনু বলল, মনে আছে দাদা, এক রাতে এমনি বৃষ্টি হয়েছিল, তুমি একটা ভূতের গল্প বলেছিলে!

আমি কথা বললাম না। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে হ্যাঁরিকেনের শিখার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাবা হঠাৎ কবে বিকৃত গলায় ডাকলেন খোকা, ও খোকা!

কী বাবা?

আয়, তুই আমার কাছে আয়! মন্টুর জন্যে বুকটা বড়ো কাঁদে রে।

তিমিরময়ী দুঃখ। প্রগাঢ় বেদনার অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে। বাইরে গাছের পাতায় বাতাস লেগে হা হা হা হা শব্দ উঠল।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

সতেরই আগষ্ট মন্টুর ফাঁসির হুকুম হল। মন্টু, যার জন্ম হয়েছিল মঘা নক্ষত্রযুক্ত সিংহ রাশিতে, রবির হোরায় বুধের দ্রেক্কাণে। কাকা বলেছিলেন, এ ছেলে হবে সাহসী, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও প্রেমিক।

মন্টুর জীবন ভিক্ষা চেয়ে আমরা মার্সি-পিটিশন করলাম। আমার মনে পড়ল ফাঁসির হুকুম হওয়ার আগের দিনটিতে রোগা, শ্যামলা একটি মেয়ে আমাদের বাসায় এসেছিল। তার মুখটা নিতান্তই সাদাসিধে, ছেলেমানুষী চাহনি। মেয়েটি রিক্সা থেকে নেমেই থাতমত খেয়ে বাসার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমায় দেখে ঢোক গিলল।

বললাম, কার খোঁজ করছেন?

মেয়েটি মাথা নিচু করে কী ভাবছিল। হঠাৎ সাহস সঞ্চয় করে বলল, আমার নাম ইয়াসমিন। আমি আপনার ভাইয়ের সাথে পড়ি।

মন্টুর সঙ্গে?

জ্বি।

আস, ভেতরে আস। তুমি করে বললাম, কিছু মনে করো না।

মেয়েটি হেসে বলল, আমি কত ছোট আপনার, তুমি করেই তো বলবেন।

বাবা, মা আর রুনু মন্টুকে দেখতে গিয়েছেন। আমি মেয়েটিকে আমার ঘরে এনে বসালাম।

বস।

এখানে কে শোয়?

আমি আর রুনু।

রুনু কোথায়?

মন্টুকে দেখতে গিয়েছে। বাবা আর মা-ও গিয়েছেন।

আরও আগে আসলে আমিও রুনুর সঙ্গে যেতে পারতাম, না?

তুমি যেতে চাও?

জ্বি না। ওর খারাপ লাগবে।

মেয়েটি চুপ করে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ঘর দেখতে লাগল।

আমি বললাম, চা খাবে?

জ্বি না।

কোথায় থাক তুমি?

উইখানে। মেয়েটি হয়তো বলতে চায় না। সে কোথায় থাকে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। সে বলল, আমি সব জানতাম, অনেক ভেবেছি আসি। কিন্তু সাহস হয় নি।

এসে কী করতে? না, কী আর করতাম। তবু হঠাৎ ইচ্ছে হত। আমি আপনাদের সবাইকে চিনি। ও আমাকে বলেছে।

কী বলেছে?

মেয়েটি মুখ নিচু করে হাসল। বলল, আপনাদের একটা কুকুর ছিল, পলা।

হ্যাঁ, শুধু পলাতক হত, তাই তার নাম পলা।

আচ্ছা, ওর কী সাজা হবে?

বারো-তোরো বৎসরের সাজা হবে হয়তো।

ফাঁসি হবে না তো?

না। উকিল বলছেন কম বয়স, আর রাগের মাথায় খুন।

ওর বুঝি খুব রাগ?

তোমার কী মনে হয়?

মেয়েটি হাসল কথা শুনে। বলল, জানি না। আমি যাই।

আবার এস।

আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল আমার।

কেন?

ও আপনাকে খুব ভালোবাসত। আমার কাছে সব সময় বলত আপনার কথা।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, ও তো মিথ্যা বলে না।

মেয়েটি চলে গেল। মন্টু হয়তো আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত। বড়ো চাপা ছেলে, বোঝবার উপায় নেই। তবে শ্রদ্ধা করত ঠিকই। না, শ্রদ্ধা নয়, ভালোবাসা বলা যেতে পারে।

মনে পড়ল এক দিন সন্ধ্যায়। রুনু এসে আমায় বলল, দাদা, মন্টু আজ বাসায় আসবে না, আমায় বলে দিয়েছে। সে কাঁঠালগাছে বসে আছে।

কেন রে?

ও শার্ট ছিঁড়ে ফেলেছে মারামারি করে। তাই আমায় বলেছে, তুমি যদি ওকে আনতে যাও, তবেই আসবে।

প্রবল ভালোবাসা না থাকলে সন্ধ্যাবেল বসে কেউ প্রতীক্ষ করে না।–কখন বড়ো ভাই এসে গাছ থেকে নামিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবে।

মন্টুর চলে যাবার পরপরই বাবা মন্টুর ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন। কত দিন আর হল মন্টু গিয়েছে, তবু মনে হয় অনেক দিন ধরেই এই ঘরে একটি মাস্টারলক ঝুলে আছে। একটু আগে যে-মেয়েটি এসেছিল, সে মন্টুর ঘর দেখতে চায় নি। কে জানে সে-ঘরের কোথাও হয়তো এই মেয়েটির লেখা দ-একটা চিঠি মলিন হয়ে পড়ে আছে। আমি মন্টুর ঘরের তালা খুলে ফেললাম। পশ্চিম দিকের জানালা খুলতেই এক চিলতে হলুদ রোদ এসে পড়ল ঘরে। পাশাপাশি দুটি চৌকি। কাকার জিনিসপত্র কিছু নেই। সমস্তই পুলিশ সিজ করে নিয়েছে। মন্টুর বিছানা, কভারছাড়া বালিশ, দড়িতে ঝোলান শার্ট-প্যান্ট সব তেমনি আছে। বাঁশের তৈরী ছাপড়ায় সুন্দর করে খবরের কাগজ সাঁটা। ঝুঁকে পড়ে তাকাতেই নজরে পড়ল টিপকলম দিয়ে লিখে রেখেছে দিন যায় দিন যায়। কী মনে করে লিখেছিল কে জানে!

৬. মন্টু

সতের তারিখ মন্টুর ফাঁসির হুকুম হল। ঠাণ্ডা মাথায় খুন, অনেক আই উইটনেস। কলেজে পড়া বিবেক-বুদ্ধির ছেলে। জজ সাহেব অবলীলায় হুকুম করলেন।

সেপ্টেম্বরের নয় তারিখ মাসি-পিটিশন অগ্রাহ্য হল। আমি জানলাম আঠার তারিখ ভোর-রাতে তার ফাঁসি হবে। তার লাশ নিতে হলে সেই সময় জেলগেটের সামনে জেলারের চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

বাবা, মা আর রুনুকে নিয়ে মন্টুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

রোগা হয়ে গিয়েছে মন্টু। আমাদের দেখে অপ্রকৃতস্থের মতো হাসল। বলল, দাদা, মার্সি-পিটিশনটার কোনো জবাব এসেছে?

ওকে বুঝি সে-কথা জানান হয় নি? ভালোই হয়েছে। আমি বললাম, না রে, এখনো আসে নি।

মা, রুনু আর বাবা কাঁদছিলেন। মন্টু বলল, কাঁদেন কেন আপনারা? আমি জানি আমার ফাঁসি হবে না। কাল রাতে মাকে স্বপ্নে দেখেছি। মা বলছেন, খোকা ভয় পাস কেন? তোর ফাঁসি হবে না।

আমি বললাম, মন্টু, তোর কাছে একটি মেয়ে এসেছিল রোগী লম্বা মতো।

মন্টু বলল, ও ইয়াসমিন, আমার সঙ্গে পড়ে।

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। মন্টু নীরবতা ভঙ্গ করে রুনুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, রুনু মিয়া মরতে ইচ্ছে হয় না।

বাবা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, তোকে কী খেতে দেয় রে?

ভালোই দেয় বাবা। আগে আজেবাজে দিত। কদিন ধরে রোজ জানতে চায়–আজি কী দিয়ে খেতে চান? এ জেলের জেলার খুব ভালো মানুষ বাবা, আমাকে শিবরামের একটা বই পাঠিয়েছেন, যা হাসির!

মা বললেন, মন্টু, বাসার কোনো জিনিস খেতে ইচ্ছে হয় তোর?

না মা, এখানে এরা বেশ রাঁধে।

সেপাই এসে বলল, অনেকক্ষণ হয়েছে তো, আরো কথা বলবেন?

বাবা বললেন, না। বাবা মন্টুর হাতে চুমু খেলেন কয়েক বার। মন্টু কাশল বার কয়। সে মনে হল একটু লজ্জা পাচ্ছে। বের হয়ে আসছি, হঠাৎ মন্টু ডাকল, দাদা, তুমি একটু থাক।

আমি ফিরে এসে মন্টুর হাত ধরলাম। মন্টু কিছু বলল না। আমি বললাম, কিছু বলবি?

না।

ইয়াসমিনের কথা কিছু বলবি?

না-না।

তবে?

মন্টু অল্প হাসল। বলল, তোমাদের আমি বড়ো ভালোবাসি দাদা।

গাছের নিচে ঘন অন্ধকার। কী গাছ এটা? বেশ ঝাঁকড়া। অসংখ্য পাখি বাসা বেঁধেছে। তাদের সাড়াশব্দ পাচ্ছি। পেছনের বিস্তীর্ণ মাঠে স্নান জ্যোৎস্নার আলো। কিছুক্ষণের ভিতরই চাঁদ ডুবে যাবে। জেলখানার সেন্ট্রি দু জন সিগারেট খাচ্ছে। দুটি আগুনের ফুলকি ওঠানামা করছে দেখতে পাচ্ছি। তাদের ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে ছায়া-ছায়া মূর্তি মনে হয়। জেলখানার মাথার গেটের ঠিক উপরে এক শ পাওয়ারের বাতি জ্বলছে একটা। বাতির চারপাশে অনেক পোকা ভিড় করেছে। বাবা বললেন, খোকা, কটা বাজে? বলতে বলতে বাবা বুকে হাত রাখলেন। তাঁর বুক-পকেটে জেলারের চিঠি রয়েছে। সেটি দেখালেই তারা মন্টুকে আমাদের হাতে তুলে দেবেন। মন্টুকে আমরা ঘরে ফিরিয়ে নেব। ঘরে, যেখানে মা আজ সারারাত ধরে কোরান শরীফ পড়ছেন।

বাইরে স্নান জ্যোৎস্না হয়েছে। কিছুক্ষণের ভিতরে চাঁদ ডুবে যাবে। আমি আর বাবা ঘোষাঘেষি করে বসে আছি সিমেন্টের ঠাণ্ডা বেঞ্চিতে। মাথার উপর ঝাঁকড়া অন্ধকার গাছ।

বাবা নড়েচড়ে বসলেন। তাঁর দ্রুত শ্বাস নেওয়ার শব্দ পাচ্ছি। তিনি একটু আগেই জানতে চাচ্ছিলেন কটা বাজে।

আমরা সবাই মাঝে মাঝে এমনি ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে বাইরের জ্যোৎস্না দেখতাম। হামুহেনা গাছে কী ফুলই না ফুটিতা! আমাদের বাসার সামনে মাঠে একটা কাঁঠালগাছ আছে। সেখানে অসংখ্য জোনাকি জ্বলিত আর নিভত। জোনাকি ঝিকিমিকি জ্বালো আলো গান বাজিয়েছিলেন নাহার ভাবী।

আমাদের পলার নাকটা ছিল সিমেন্টের মেঝের মতোই ঠাণ্ডা। মন্টু বলেছিল, দাদা, কুকুরের নাক এত ঠাণ্ডা কেন?

মাস্টার কাকা বাইরে পসে বসে আকাশের তারা দেখতেন। বলতেন, খোকা, আমি তারা দেখে সময় বলতে পারি।

রাবেয়া এক দিন রাগ হয়ে বলেছিল মা আমি সবার বড়ো, কিন্তু কেউ ঈদের দিন আমাকে সালাম করে না।

আমি আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে আছি। আমার শীত করছে। বাবা ভারি গলায় ডাকলেন, খোকা, খোকা।

কি বাবা?

কটো বাজে রে? আমি বাবার হাত ধরলাম। কী শীতল হাত। বাবা থরথর করে কাঁপছেন। আমাদের মাথার উপরের ঝাঁকড়া গাছ থেকে আচমকা অসংখ্য কাক কা-কা ডেকে জেলখানার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

ভোর হয়ে আসছে। দেখলাম চাঁদ ডুবে গেছে। কিন্তীর্ণ মাঠের উপরে চাদরের মতো পড়ে থাকা ম্লান জ্যোৎস্নাটা আর নেই।